বাংলাদেশে খ্রিস্টান মিশনারীদের ব্যাপক ধর্মান্তকরন এবং আমাদের করণীয়

ডক্টর. মোঃ লিটন হোসেন

ছাত্র, ফাইনাল ইয়ার

ব্যাচেলর অফ দাওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিস

ইসলামিক অনলাইন মাদরাসাহ

মুগদা, মান্দা, ঢাকা, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

ক। ভূমিকা ৩

খ। দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য ৩

১। দাওয়াতের সংজ্ঞা..৩

২। দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ ৩

৩। দাওয়াতের অপরিহার্যতা..৩

৪। মুসলিম উম্মাহর উপর দাওয়াত দানের আবশ্যকতা.. ৪

৫। দাওয়াতের ফযীলত ৪

খ। বাংলাদেশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে খ্রিস্টধর্ম ও তার ক্রমবিকাশঃ ৫

গ। এনজিওদের কার্যক্রম ১২

১। চার্চ অফ বাংলাদেশ ১২

২। সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট ১৩

৩। হিড বাংলাদেশ..১৩

৪। সি. সি. ডি. ভি. ১৩

ঘ। খৃষ্টান বানানোর কৌশল..১৩

কৌশল-১...১৩

কৌশল-২.. ১৪

কৌশল-৩. .... ১৪

কৌশল-৪.. ১৪

কৌশল-৫.. ১৪

কৌশল-৬. .... ১৪

ঙ। প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা ও প্রচার মাধ্যম.. ১৫

১।বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক ১৫

২।বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি ১৬

৩।ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন..১৬

৪।মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল..১৬

৫।ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার..১৬

৬।বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি ১৭

৭। পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা ১৭

৮। নকল ইমাম তৈরি ১৭

৯।ইসলামী নাম ধারণ.. ১৭

১০।যুবতী প্রচারক ১৭
১১। সমিতির মাধ্যমে প্রচার ১৭
চ। সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি? ১৮
১। মি. বুশের একটি ভাষণ ১৮
২। মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে তাদের টার্গেট ১৮
ছ। পরিসংখ্যান ১৯
জ। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করনের অপতৎপরতাঃ ১৯
১। উত্তরবঙ্গঃ ১৯
ক। সাঁওতালদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা ২০
খ। দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে মুসলমানদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা ২১
গ। লালমনিরহাটের মসজিদের খতীব খৃষ্টান ২৩
ঘ। ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন ২৩
ঙ। নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য ২৩
চ। পঞ্চগড় জেলায় মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী ২৪
২। জামালপুর জেলায় খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা ২৪
ক। জামালপুরে মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ ২৪
খ। জামালপুরের মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান ২৫
৩। ময়মনসিংহ জেলা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা ২৫
ক: ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা ২৫
খ: ৩০ হাজার গারো উপজাতি খৃষ্টান হয়েছে ২৬
গ: খৃষ্টান প্রচারকের সাথে বিতর্ক ও দাওয়াত ২৬
৪। নেত্রকোনা জেলায় খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা ২৭
৫। চট্টগ্রামে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা ২৭
ক। জুমল্যান্ড পরিকল্পনা ২৭
আমাদের করণীয় ২৮
রেফারেন্সসমুহ ৩৩

ক। ভূমিকা :

نحمده و نصلى على رسوله الكريم - পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি যার নিকট ইসলাম হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন- اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْاِسْلَامُ (৩:১৯) । সেই মনোনীত দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। এই প্রচার ও প্রসারের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে দাওয়াত। সুষ্ঠু সমাজ বিনির্মাণে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ তা'আলার দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা-وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (৩:১০৪) - 'আর তোমাদের মধ্যে একটা দল থাকা চাই, যারা মানুষকে কল্যাণের দিকে আহবান করবে ও অন্যায় থেকে নিষেধ করবে। বস্ততঃ তারাই হ'ল সফলকাম'।

খ। দাওয়াতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য :

১। দাওয়াতের সংজ্ঞা :

আরবীতে 'দাওয়াত' (اَلدَّعْوَةُ) শব্দটি মাছদার বা ক্রিয়ামূল। যার অর্থ ডাকা। যেমন-

তিনি আরো বলেন,أُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ 'যখন আমাকে ডাকা হয়, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দেই' (বাক্বারাহ ২/১৮৬)।

২। দাওয়াতের পারিভাষিক অর্থ :

ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ) বলেন, الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا- 'আল্লাহর দিকে দাওয়াত হচ্ছে, আল্লাহর প্রতি ও তাঁর রাসূলগণ যা নিয়ে এসেছেন তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন, তাঁরা যেসব বিষয়ে সংবাদ দিয়েছেন সেসব সত্য বলে স্বীকার এবং যেসব তাঁরা আদেশ দিয়েছেন সেসব বিষয়ে তাদের আনুগত্য করার দিকে আহবান জানানো [১]।

৩। দাওয়াতের অপরিহার্যতা :

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে আরবের সামাজিক জীবন যেমন অনাচার, পাপাচার, দুর্নীতি, কুসংস্কার, অরাজকতা, ঘৃণ্য আচার-অনুষ্ঠান এবং নিন্দনীয় কার্যকলাপে পরিপূর্ণ ছিল, তেমনি বর্তমান সমাজ ব্যবস্থাও আমাদেরকে আইয়ামে জাহেলিয়াতের সেই বর্বর সমাজচিত্রের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই জাহেলিয়াতের মূলোৎপাটনের জন্যই আল্লাহ তা'আলা মানবতার মুক্তির দূত হিসাবে মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি এসে মানব সমাজকে আল্লাহর নির্দেশিত পথের দিকে আহবান করেন এবং জাহেলিয়াতের ঘোর অমানিশা থেকে মানুষকে রক্ষা করেন। আল্লাহ বলেন, كَمَا أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَالَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ- 'যেমন আমরা তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য একজন রাসূল প্রেরণ করেছি, যিনি তোমাদের নিকটে আমাদের আয়াত সমূহ পাঠ করে শুনান। আর যিনি তোমাদের পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও সুন্নাহ শিক্ষা দেন। তোমাদেরকে এমন সব বিষয় শিক্ষা দেন, যা তোমরা জানতে না' (বাক্বারাহ ২/১৫১)। তিনি আরো বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- 'হে নবী বলুন! এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)। আল্লাহ মহা পবিত্র। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই' (ইউসুফ ১২/১০৮)। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, يَاَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا وَّدَاعِيًا إِلَى اللهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُّنِيْرًا- 'হে নবী! আমরা তোমাকে সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে প্রেরণ করেছি এবং আল্লাহর আদেশক্রমে তাঁর পথে দাওয়াত দানকারী হিসাবে ও উজ্জ্বল প্রদীপ রূপে' (আহযাব ৩৩/৪৪-৪৫)।

আমাদের সমাজও আজ জাহেলী যুগের ন্যায় অন্ধকারের অতল গহবরে নিমজ্জিত। মানব রচিত কোন তন্ত্র-মন্ত্র দিয়ে তমসাচ্ছন্ন এই সমাজকে রক্ষা করা আদৌ সম্ভব নয়। একমাত্র বিশ্ব সংস্কারক মুহাম্মাদ (ছাঃ) প্রদর্শিত পন্থায় দাওয়াত দানের মাধ্যমেই এই সমাজের উত্তরণের পথ উন্মোচিত হ'তে পারে। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্দেশিত পদ্ধতিতে মানবতাকে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আহবান করতে হবে। وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمرِو بنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلاَ حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ رواه البخاري 'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমার পক্ষ থেকে জনগণকে (আল্লাহর বিধান) পৌঁছে দাও, যদিও একটি আয়াত হয়। বনী-ইস্রাঈল থেকে (ঘটনা)

বর্ণনা কর, তাতে কোন ক্ষতি নেই। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার প্রতি মিথ্যা (বা জাল হাদীস) আরোপ করল, সে যেন নিজ আশ্রয় জাহান্নামে বানিয়ে নিল। (বুখারী ৩৪৬১) ।

৪। মুসলিম উম্মাহর উপর দাওয়াত দানের আবশ্যকতা:

সকল নবীগণ মানুষকে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দিয়েছে। আমাদের নাবী মুহাম্মাদ (সঃ) কে সমস্ত মানুষের নাবী করে পাঠানো হয়েছে রিসালাত এর মহান এক দায়িত্ব দিয়ে। পবিত্র কুরআনের অমিয় বাণী, يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ- ‘হে রাসূল! তোমার প্রতি তোমার প্রভুর পক্ষ হ’তে যা নাযিল হয়েছে (অর্থাৎ কুরআন), তা মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। যদি না দাও, তাহ’লে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছে দিলে না’ (মায়েদাহ ৫/৬৭)। আল্লাহ তায়ালা বলেন আরও বলেন, قُلْ هَذِهِ سَبِيْلِيْ أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيْرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ- ‘হে নবী বলুন! এটিই আমার পথ। আমি এবং আমার অনুসারীগণ ডাকি আল্লাহর পথে জাগ্রত জ্ঞান সহকারে (সুস্পষ্ট দলীল সহকারে)।আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই’ (ইউসুফ ১২/১০৮)। এখানে وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ এর দ্বারা মহানবী (ছাঃ)-এর দাওয়াতের এই গুরুভার তাঁর উম্মতের উপর অর্পিত হয়েছে। সেকারণ এ মহান দায়িত্বে অবহেলা করা চলবে না, বরং তা পালন করতে হবে যথাযথভাবে। عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه و سلم يَقُولُ: "مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"- ‘আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ’আনহু হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু ’আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: "তোমাদের মধ্যে কেউ কোন অন্যায় দেখলে তা সে তার হাত দ্বারা প্রতিহত করবে, যদি তা সম্ভব না হয় তবে মুখ দ্বারা প্রতিহত করবে, তাও যদি না করতে পারে তাহলে অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করবে। আর এ হচ্ছে (অন্তর দিয়ে প্রতিহত করা) দুর্বলতম ঈমান’ [মুসলিম: ৪৯]’। আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, يَقُوْلُ إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مِنْكُمْ فَلَمْ يُغَيِّرُوهُ يُوْشِكُ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابِهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ أَبِيْ دَاوُدَ مَا مِنْ قَوْمٍ يَعْمَلُ فِيْهِمْ بِالْمَعَاصِيْ ثُمَّ يَقْدِرُوْنَ عَلَى أَنْ يُغَيِّرُوْا ثُمَّ لاَ يُغَيِّرُوْنَ إِلاَّ أَنْ يَعُمَّهُمُ اللهُ بِعِقَابٍ. ‘নিশ্চয়ই মানুষ যখন কোন গর্হিত কর্ম দেখে তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা না করে, অচিরেই আল্লাহ তাদের সকলকে শাস্তি দিবেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যখন কোন সম্প্রদায়ের মাঝে পাপ হ’তে থাকে এবং প্রতিরোধ করতে সক্ষম ব্যক্তিরা প্রতিরোধ না করে, তখন আল্লাহ সকলকেই শাস্তি দেন’ (মিশকাত হা/৫১৪২)।

৫। দাওয়াতের ফযীলত:

আল্লাহর পথে দাওয়াতের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَلاَ تَسْتَوِى الْحَسَنَةُ وَلاَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِيْ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيْمٌ. ‘ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে কার কথা উত্তম হ’তে পারে, যে আল্লাহর পথে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। সৎকর্ম ও অসৎকর্ম কখনো সমান নয়। প্রত্যুত্তর নম্রভাবে দাও, দেখবে তোমার শত্রুও অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে পরিণত হয়েছে’ (হা-মীম সাজদা ৪১/৩৩-৩৪)। উপরোক্ত আয়াতে দাওয়াতের গুরুত্ব ফুটে উঠেছে। এর ফলে পারস্পরিক শত্রুতা দূরীভূত হয় এবং বন্ধুত্ব ফিরে আসে। একে অপরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালবাসা সৃষ্টি হয়। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন,كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ- ‘তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে মানবজাতির কল্যাণের জন্য। তোমরা সৎকাজের আদেশ করবে ও অন্যায় কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর উপর ঈমান আনবে’ (আলে ইমরান ৩/১১০)। আলোচ্য আয়াতে শ্রেষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গুণ হিসাবে ‘আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার’ তথা সৎ কর্মের আদেশ ও অন্যায় ও নিষিদ্ধ কর্মের নিষেধাজ্ঞা উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا- ‘যে ব্যক্তি হেদায়াতের দিকে আহবান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ নেকী রয়েছে। কিন্তু তাদের নেকী থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না। অপরদিকে যে ব্যক্তি ভ্রষ্টতার দিকে আহবান করবে তার জন্য তার অনুসারী ব্যক্তিদের সমপরিমাণ পাপ রয়েছে। কিন্তু তাদের পাপ থেকে বিন্দু পরিমাণও হ্রাস করা হবে না’ (মুসলিম ৬৯৮০ প্রমুখ)। অন্য বর্ণনায় এসেছে, فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘যে ব্যক্তি কল্যাণের দিকে পথ দেখায় তার জন্য কল্যাণকর কাজ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ পুরস্কার রয়েছে’(মুসলিম ১৮৯৩)।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে দাওয়াতের কাজ করলে আমরা যেমন দুনিয়া ও আখিরাতে উচু মাকাম ও মর্যাদা পাব তেমনি এই কাজ না করার দ্বারা লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে আমাদের দুনিয়া ও আখিরাতের জীবন। আমরা আজ এই ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। অথচ খ্রিস্টান সম্প্রদায় তাদের মিশনারি এর মাধ্যমে দুনিয়াজুড়ে ধর্মপ্রচারে লিপ্ত যার প্রভাবে অসংখ্য মানুষ হারাচ্ছে তাদের মহা

মুল্যবান সম্পদ ইমান। বাংলাদেশ আজ খ্রিস্টান মিশনারী দ্বারা আক্রান্ত। মিশনারীরা আমাদের দেশে শিকড় গেড়ে বসেছে। মজবুত করে চলেছে দিন দিন নিজেদের ভিত। আজ এ দেশে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে তাদের সফলতার পতাকা উড়ছে। ক্রমশ তাদের মিশন সফলতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সেবার তকমা-তাবিজ নিয়ে বাড়িতে বাড়িতে দাওয়াত দিচ্ছে। কৃত্তিম পরিস্থিতি দ্বারা সাধারণ মুসলিমদের বাধ্য করছে ধর্মান্তরিত হতে; আর দিকভ্রান্ত মুসলিম ভাইয়েরাও তাদের বেড়াজালে আবদ্ধ হতে যাচ্ছে। খ্রিস্টান মিশনারির এই অপতৎপরতার প্রভাব বাংলাদেশও বিদ্যমান যা এই বই এর আলোচ্য বিষয়।

বাংলাদেশ এবং ভারতীয় উপমহাদেশে খৃষ্টধর্ম ও তার ক্রমবিকাশঃ [২-৩]

কথিত আছে যে, সেইন্ট টমাস ছিলেন প্রথম খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক যিনি হযরত ঈসা আ. এর ১২ জন মনোনিত হাওয়ারীদের একজন। তিনি ৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ৫৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ মালাবার উপকূলে একদল লোককে খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তখন থেকে সিরীয়, রোমান ক্যাথলিক ও বিশেষত জেসুইট সম্প্রদায়ের ধর্মপ্রচারকগণ নানা সময় ভারত সফর করেন। কিন্তু খ্রিস্ট ধর্ম দক্ষিণ ভারতের উপকূলবর্তী এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকে। তিনি ৭২খ্রি. সেখানে সাক্ষ্যমর বা ধর্মশহীদ হন। তিনি ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে ৭টি গীর্জা স্থাপন করেন।

তৎকালীন ভারত উপমহাদেশ অর্থনীতিতে খ্যাতি লাভ করায় ইউরোপের ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। বাদশাহ আকবর সিংহাসন লাভ করার পর সর্বপ্রথম ৯০৪হি. মোতাবেক ১৪৯৮খ্রি. পর্তুগীজরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে উপমহাদেশে আসে। উপমহাদেশের পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি দুর্গ ও ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করে। পর্তুগীজ ব্যবসায়ীদের সাথে খ্রিস্টান মিশনারীদেরও আগমন ঘটে।

বাদশাহ আকবরের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করার আকাঙ্খা ছিলো। এ সুবর্ণ সুযোগের সদ্ব্যবহার করে পর্তুগীজ মিশনরীরা তাকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টা করে। আকবরও বিভিন্ন সময় পর্তুগীজ মিশনারীর সাথে সাক্ষাত করেন। নিজ দরবারে তাদের স্থান দেন এবং সহায়তা ও সমাদর করতে থাকেন।

পর্তুগীজ মিশনারীদের চিঠিপত্র ও জার্নাল, রোমান যাজক পাইট্রো ডেলা ভ্যালির বিবরণ এবং ইংরেজ যাজক রালফ ফিঞ্চের লেখালেখিতে তাকে খ্রিস্টান বানানোর চেষ্টার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

পর্তুগীজরা উপমহাদেশে অবস্থানকালে সরকারের উচ্চমহল ছাড়াও সর্বসাধারণের মাঝে খ্রিস্টধর্ম প্রচারের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে। অবশেষে যখন তারা মোগলদের প্রতিরোধের মুখে ১৫৩২খৃ. উপমহাদেশ ছাড়তে বাধ্য হয়, তখনও তাদের বন্দর এলাকাতে চার হাজার বাঙালী পাওয়া যায়, যাদেরকে জোরপূর্বক খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার জন্য আটক রাখা হয়েছিলো। (মাগল সাম্রাজ্যের সোনালী অধ্যায়; সাহাদত হোসেন খান পৃ.৫০৮)

মোগল দরবারে পর্তুগীজদের উপস্থিতি ও ব্যবসায়ীক উন্নতির দিকে জার্মান, ফ্রান্স, ও ইংরেজদের মনোযোগ নিবিষ্ট হয়। তবে ব্যবসায়িক প্রতিকূলতা, ঝক্কি-জটিলতায় সুবিধা করতে না পেরে এ দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়। পর্তুগীজরা বিভিন্নভাবে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করায় তাদেরকেও বিতাড়িত হতে হয়। শুধু ইংরেজরাই থেকে যায়।

জেসুইট সম্প্রদায়ের প্রচারকদের মাধ্যমে খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারক দলের সাথে বাংলার সংযোগ স্থাপিত হয়; ১৫৭৬ সালে ফাদার অ্যান্টোনী ভাজ ও ফাদার পিটার ডায়াস এবং ১৫৮০ সালে রোমান ক্যাথলিক যাজকদের আগমন ঘটে। ওলন্দাজদের দ্বারা স্থাপিত শহর ব্যান্ডেল তাঁদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত হয়। প্রারম্ভে জেসুইট ও রোমান ক্যাথলিকবৃন্দ একত্রে কাজ করেছেন এবং ১৫৯৯ সালে একটি গির্জা ও একটি মঠ স্থাপন করেন। ধর্ম শিক্ষার জন্য একটি কনভেন্ট স্কুল ও সেইন্ট পলের জেসুইট কলেজও প্রতিষ্ঠা করা হয়।

পর্তুগীজ ব্যবসায়ীরাই হলো বাংলার প্রথম খ্রিস্টান। পরবর্তিতে তাদের বংশধর ও ধর্মান্তরিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে এ দেশে খ্রিস্টধর্ম বিস্তার লাভ করে। ফাদার ফ্রান্সিসকো ১৫৯৮ খৃ. বাংলাদেশে আসে এবং বন্দীদশায় মৃত্যুবরণ করে। খ্রিস্টানরা তাকে বাংলার প্রথম ধর্মশহীদ বলে আখ্যায়িত করে। ১৫৯৯ খৃ. তাদের একদল যশোরে আসে এবং ইশ্বরীপুর এলাকায় ‘Holy Name of Jesus (যীশুরপবিত্র নামের গীর্জা) নামে একটি গীর্জা নির্মাণ করে। ১৬০০খৃ. ১লা জানুয়ারী তা উদ্বোধন করা হয়। ১৬০০ খৃস্টাব্দে ২৪ শে জুনে চট্টগ্রামে দ্বিতীয় গীর্জা নির্মান করে।

১৬১২ খৃ. ঢাকায় প্রথম পর্তুগীজ আগস্টিনিয়ান পুরোহিতগণের আগমন ঘটে। ১৬২২ সালে সেইন্ট পল কলেজের রেক্টর হিসেবে ফাদার পিটার গোমেজের নিয়োগের মধ্য দিয়ে ধর্মসংক্রান্ত শিক্ষা কার্যক্রম পূর্ণোদ্যমে শুরু হয়। বি. রড্রিকস্, জেমস গোমেজ, সাইমন দি ফিগুরেডো ও আন্দ্রে ম্যাশাডো এটিকে শিক্ষাদান ও খ্রিস্টান ধর্মের সুসমাচার পৌঁছানোর একটি মহতী কেন্দ্রে পরিণত করেন। এক দশকের মধ্যে দশ

হাজারের মতো ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করা হয় বলে দাবি করা হয়। ইংরেজরা ১৬১২খৃ. গুজরাটের বন্দর এলাকা সূরাটে ‘ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি’ নামে কারখানা স্থাপন করে।

১৬২৮ খৃ. ঢাকার নারিন্দায় একটি গীর্জা নির্মিত হয় যার নাম রাখা হয় ‘Church of the Assumption’’। ১৬ শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এ অঞ্চলের (বর্তমান বাংলাদেশ ও তদসংলগ্ন এলাকাসমূহ) বিভিন্ন স্থানে আগত ক্যাথলিকরা বসবাস করত। তৎকালীন খ্রিস্টান জনবসতিগুলোর মধ্যে ময়মনসিংহ জেলার হুসাইনপুর এবং পূর্ব বাংলার প্রাচীন রাজধানী সোনারগাঁয়ের নিকটবর্তী শ্রীপুর উলেখযোগ্য।

১৬৩৩ খৃষ্টাব্দে সম্রাট শাহজাহান ৭৭৭ বিঘা জমি বিনা খাজনায় (লা-খেরাজ) খৃষ্টান মিশনারিদের দান করলেন। ফলে তারা আরো বেশী উৎসাহিত হয়। ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, মোঘল আমলে খৃষ্টান মিশনারিরা অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে তোলে। (আমাদের মধ্যে যেমন বিভিন্ন দল-উপদল আছে, তেমন খৃষ্টানদের মধ্যে বিভিন্ন দল আছে, যেমন – জেসুইল, অগস্টেইনিয়া, ক্যাথলিক, ব্যাপটিস্ট, প্রটেস্ট্যান্ট ইত্যাদি) মোগল আমলে মোগল বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে বাংলায় ১৬৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ১৩ টি অগস্টেইনিয়া গির্জা গড়ে উঠে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে রোমান ক্যাথলিকদের সংখ্যা বেশী। ব্যাপটিস্টদের সংখ্যাও কম নয়।

১৬০৬ সালে মিলাপুর (মাদ্রাজ, ভারত) বিশপীয় এলাকায় উন্নীত হলে, বাংলার মিশনারী ষ্টেশনসমূহ তার আওতাভূক্ত করা হয়। এ সময় ১৬৭৭ সালে তেজগাঁওয়ে, ১৬৯৫ সালে নাগেরীতে এবং বিভিন্ন স্থানে আরো গীর্জা নির্মাণ করা হয়।

ইংরেজরা বাহ্যত ব্যবসা উদ্দেশ্য থাকলেও স্বপ্ন দেখতে থাকে এ দেশের শাসন ক্ষমতা দখলে নেওয়ার। অগোচরে প্রস্তুতিও নিতে আরম্ভ করে। মোগল বাদশাহ তাদের দূরভিসন্ধি উপলব্ধি করতে পেরে তাদের ধন-সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেন। সংশ্লিষ্ট লোকদের গ্রেপ্তার করার নির্দেশও জারি করেন।ইংরেজরা অনুতপ্ত হয়ে বাংলার গভর্ণরের নিকট ক্ষমা প্রর্থনা করে এবং ব্যবসার জন্য পুনরায় অনুমতির আবেদন করে। বাংলার গভর্ণর ১৬৯০খ্রি. পুনরায় তাদেরকে শর্তসাপেক্ষে ব্যবসা করার অনুমতি প্রদান করেন। পিছনের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা পূর্ণ সতর্কতার সাথে অগ্রসর হতে থাকে। ভিত দৃঢ়স্থির হওয়ার পর নানাবিধ কলা-কৌশলে কখনোবা যুদ্ধের মাধ্যমে একের পর এক ভূখণ্ড দখল করতে থাকে। ১৭৯৯খ্রি. সুলতান টিপুর শাহাদাতের পর ইংরেজরা যথার্থই বলেছিল, ‘আজ থেকে হিন্দুস্তান আমাদের’। (দ্রষ্টব্য. তারীখে হিন্দ; মুহাম্মাদ আমীন, মোগল সাম্রাজ্যের সোনালী অধ্যায়; সাহাদত হোসেন খান)। ইংরেজরা অস্ত্র ও প্রযুক্তির জোরে দেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে। বিদ্রোহের পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে সহস্রাধিক মুসলমান আলেম ও বিদ্বানদের শহীদ করে। সর্বত্র ফাঁসি আর ডান্ডাবেরির ভীতি ছড়িয়ে দেয়।

আঠারো শতকের শেষ দশকে ব্রিটিশ প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকদের আগমনের সাথে সাথে বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচার কাজ একটি সংগঠিত আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। সমসাময়িক ইংল্যান্ডে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবনের ফলে সকল দেশে খ্রিস্টের বাণী প্রচারের জন্য বেশ কয়েকটি ধর্মপ্রচারক সমিতি গঠিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হলো ১৭৯২, ১৭৯৫ ও ১৭৯৯ সালে প্রতিষ্ঠিত যথাক্রমে ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটি, লন্ডন মিশনারি সোসাইটি ও চার্চ মিশনারি সোসাইটি। প্রথম দুটি ছিল নন্-কনফ্রমিস্ট সংগঠন ও তৃতীয়টি ছিল অ্যাংলিকান (ইংল্যান্ডের সরকার কর্তৃক অনুমোদিত গির্জার প্রতিনিধিত্বকারী)।

১৮০০ সালে যাজক উইলিয়ম কেরীর বাংলায় আগমনের পর তাঁর অধীনে বাংলায় প্রথম সংগঠিত ধর্মপ্রচার কাজ শুরু হয়। ওই বছর শ্রীরামপুরে (সে সময়ে ডেনমার্কের নিয়ন্ত্রণে) কেরী প্রথম ব্যাপ্টিস্ট মিশন আরম্ভ করেন। তাঁর দুজন সহযোগী ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যান (১৭৬৮-১৮৩৭) ও উইলিয়ম ওয়ার্ড (১৭৬৯-১৮২৩) এবং তাঁরা বিখ্যাত শ্রীরামপুর ত্রয়ীর সদস্য ছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, শুধু খ্রিস্টানদের সত্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা শিক্ষাই এ সামাজিক ব্যাধিসমূহ দূর করতে পারে। প্রাথমিকভাবে মাতৃভাষার প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শ্রীরামপুর ত্রয়ী গ্রাম্য পাঠশালার ওপর ভিত্তি করে বিরাজমান শিক্ষা ব্যবস্থায় খ্রিস্টান ধারণাসমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। সাধারণ জনগণের নিকট শিক্ষা পৌঁছে দিতে ‘সর্দার-পড়ো’র মতো দেশিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে কেরী জনগণের শিক্ষার একটি কার্যক্রম গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। ১৮৩০-এর দশকে ইংরেজদের দ্বারা প্রচলিত রীতি হিসেবে চালু করা শিক্ষার ব্যাপারে ‘নিম্ন দিকে চোয়ানো তত্ত্বে’ (downward filtration theory) উইলিয়ম কেরীর কোনো আস্থা ছিল না এবং তিনি শিক্ষা ব্যবস্থাকে নিম্ন দিক থেকে গড়ে উপরের দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। এ উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর সহযোগী জে. মার্শম্যান ১৮১৬ সালে গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষা শিক্ষাদানকারী স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য ‘স্থানীয় স্কুল সম্বন্ধে আভাস’ নামে পরিচিত একটি সম্পূর্ণ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করেন। এতে জোর দেওয়া হয় যে, শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত জনগণের মাতৃভাষা। গ্রামের স্কুলসমূহের উচিত পাটিগণিত, প্রাথমিক বিজ্ঞান, ইতিহাস ও ভূগোলের মোটামুটি প্রধান অংশসমূহ, প্রাকৃতিক দর্শন, ধর্মশাস্ত্র ও

নীতিশাস্ত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে 'উন্নত' পাঠক্রম অনুসরণ করা। এ কর্মপরিকল্পনা আপাতভাবে সাফল্যমন্ডিত হয়; ১৮১৮ সাল নাগাদ ৬,৭০৩ জন ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে ১০৩টি প্রাথমিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়।

লন্ডন মিশনারি সোসাইটিও ওলন্দাজদের শহর চুঁচুড়ায় ১৭৯৮ সালে ন্যাথানিয়েল ফোরসিথের অধীনে ধর্মপ্রচার কাজ শুরু করেন। কোম্পানির ১৮১৩ সালের সনদের মাধ্যমে ভারতে ধর্মপ্রচারকদের উদ্যোগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পর চার্চ মিশনারি সোসাইটি ভারতে প্রবেশ করে; এদের প্রথম ধর্মপ্রচারকদ্বয় গ্রীনউড ও স্ক্রোয়েটার ১৮১৬ সালে কলকাতায় এসে পৌঁছান।

কেরী ছিলেন বিশিষ্ট ভাষাবিদ। তাঁর নির্দেশনায় শ্রীরামপুর মিশন প্রেস পূর্ণাঙ্গ বাইবেলের বাংলা, অহমীয়, উড়িয়া, হিন্দি, মারাঠি ও সংস্কৃত অনুবাদ ছাপায়। বাইবেলের অনুবাদ ছাড়াও ব্যাপ্টিস্টগণ ও তাঁদের ভারতীয় সহযোগীবৃন্দ (যেমন, রামরাম বসু ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার) রামায়ণ ও অন্যান্য ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের অংশ বিশেষ অনুবাদ করেন। তাঁরা বহুসংখ্যক গবেষণামূলক প্রবন্ধ অথবা প্রচারণমূলক পুস্তিকা (১৮২৯ সাল নাগাদ প্রায় ৩৩,০৫০টি) অনুবাদ, মুদ্রণ ও বিতরণ করেন। এ দৃষ্টান্ত কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটিকে (১৮১৭) ১৮২১ সাল নাগাদ বাংলায় পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করতে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রকাশনাসমূহ সন্দেহাতীতভাবে বাংলা গদ্য সাহিত্যের অগ্রগতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে।

১৮৩০ সালে আলেকজান্ডার ডাফ (১৮০৮-১৮৭৮)-এর অধীনে স্কটল্যান্ডের গির্জা বাংলায় ধর্মপ্রচার কাজ শুরু করে। কিন্তু এ সকল গির্জা বাংলায় ধর্মপ্রচার কাজ চালানোর ক্ষেত্রে প্রোটেস্ট্যান্ট সম্প্রদায়ভুক্ত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়। ১৮৩১ সালে আন্তঃসম্প্রদায়গত ক্যালকাটা মিশনারি কনফারেন্স গঠন এ ধরনের সম্প্রদায়গত মননের উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

মিঃ রিজ মিশনারী ১৮৩৫ খ্রিস্টব্দের ১৫ জুলাই পুরানো ঢাকার সদরঘাটে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের জন্য পূর্ব বাংলায় এটাই প্রথম বিদ্যালয়।

১৮৩৪ সালে বাংলার প্যারিশ (যাজকীয় এলাকা) প্রতিষ্ঠিত হয়, যা ১৮৫০-এ বিধিসম্মতভাবে পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলা দুই অংশে বিভক্ত হয়। ১৮৪০-এর দশকে বরিশাল ও যশোহর (ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি সোসাইটির আবাসস্থল) থেকে বৃহৎ সংখ্যক 'কর্তাভজা'ও খ্রিস্টান হয়। উনিশ শতকে বাংলায় এটা ছিল খ্রিস্টান ধর্মের প্রতি সাধারণ জনতার পবির্তনের প্রথম ও সবচেয়ে স্মরণীয় ঘটনা।

১৮৪৫ সালে চট্টগ্রাম পূর্ব বাংলার (যাজকীয়) প্রশাসনিক কেন্দ্র হয়। পরে অবশ্য তা ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ১৮৫৩ খৃ. জুন মাসে নোয়াখালীতে হলিক্রস মিশনারীরা পৌঁছে।

ধর্ম প্রচারের পথ আরো সুগম করতে নির্বিচারে আলেম ওলামাকে হত্যা ও জেল হাজতে আবদ্ধ করতে থাকে। ইসলাম ধর্ম শিক্ষার পথ বন্ধ করে দেয়। মাদরাসার সকল সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে। এ পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ ভেবেই নিয়েছিলো, ভারতে আর নিজ নিজ ধর্ম ও কালচার নিয়ে বেঁচে থাকা সম্ভব হবে না। অচিরেই সর্বস্তরের মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হতে বাধ্য করা হবে। এখন প্রকাশ্যে কিছু না বললেও ধীরে ধীরে বাস্তবায়ন করবেই। কারণ, ইংরেজদের পলিসি এমন ছিলো যে, কোনো কাজ দ্রুত করত না বরং ধীরে ধীরে উদ্দেশ্যে পৌঁছে যেত। ১৮৫৫ খ্রি. বিদেশী ধর্মপ্রচারকরা যশোর ও তার আশপাশ এলাকায় ধর্মশিক্ষাদান এবং প্রচারকার্য শুরু করে।

পাদ্রী আই. এডমেন্ড ১৮৫৫ খৃ. কলকাতা থেকে সাধারণদের মাঝে এবং উচ্চপদস্থ চাকুরীজিবীদের কাছে বিশেষভাবে চিঠি প্রেরণ করে এ ঘোষণা দিলো যে, 'প্রযুক্তির প্রভাবে পুরো উপমহাদেশ এক শহরে পরিণত হয়েছে। সুতরাং সবার ধর্মও এক হতে হবে'।

দারিদ্রের কশাঘাতে পীড়িত মুসলমানরা এ ঘোষণায় আরো বিচলিত ও শংকিত হয়ে গেলো। এখন তো আর উপায় নেই। যে কোনো মূল্যে খ্রিস্টান বানিয়েই ছাড়বে। তাই ইংরেজরা কোন এলাকা দখল করলে, সরকার পতন বা দখল নিয়ে চিন্তার তুলনায় বেশী চিন্তা হত নিজ ধর্মের। (দ্রষ্টব্য. ওলামায়ে হিন্দ কা শান্দারে মাযী; মাওলানা সায়্যেদ মুহাম্মাদ মিঞা রহ.)

১৮৫৭ সালে আযাদী আন্দোলনের পর এই উপমহাদেশে ৯০ টি প্রটেস্ট্যান্ট খৃষ্টান মিশনারি কর্মরত ছিল। তারা এদেশে জটিল রোগের চিকিৎসার জন্যে বড় বড় ডাক্তার, সার্জনদের ইংল্যান্ড থেকে নিয়ে আসে এবং চট্টগ্রাম, কক্সবাজারের মালুমা ঘাট, ময়মনসিংহ, রংপুর, রাজশাহীসহ দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাসপাতাল তৈরি করে বিনা পয়সায় চিকিৎসা সেবা দেয়। এর আড়ালে সমতল ভূমি ও পার্বত্য এলাকায় খৃষ্টধর্ম প্রচার পুরোপুরি অব্যাহত রাখে। আযাদী আন্দোলনের পর ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানদের Board of Directors গৃহীত প্রস্তাবে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তাতে খোলাখুলি বলা হয়েছে যে, "প্রকৃতি ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি এই জন্যে ব্রিটেনের কাছে সোপর্দ করে,

যাতে এতদঅঞ্চলের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত মিশনারিদের বিজয় পতাকা উড্ডীন হয়। তাই এতদঞ্চলকে খৃষ্টান রাষ্ট্রে পরিণত করার আপ্রাণ চেষ্টা করা উচিৎ।" (সূত্রঃ তারিখে পাকিস্তান)

১৮৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর বর্তমান চট্টগ্রাম বিভাগীয় এলাকা, শিলচর (বর্তমানে ভারতে) এবং প্রোম (বর্তমানে মায়ানমারে) এর সমন্বয়ে ঢাকা বিশপের এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯০৮ সালে ব্রিটিশ আমলে চট্টগ্রামের চন্দ্রঘোনায় ব্যাপটিস্টরা এসে একটি সোসাইটি হাসপাতাল গড়ে তোলে। লেবৃসি হসপিটাল কুষ্ঠনিরাময় কেন্দ্র খোলে। বাংলাদেশে মোট খৃষ্টান সংখ্যা ৫ লাখ, এর মধ্যে ব্যাপটিস্ট খৃষ্টানদের সংখ্যা বর্তমানে ১ লক্ষ ৩৪ হাজার। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন ছলে বলে কৌশলে পুরো ভারতের ক্ষমতা হাতে নিলো, তখন মূলত আনুষ্ঠানিকভাবে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা চালু হয়। পর্যায়ক্রমে পাকিস্তান আমলে এবং পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারিদের তৎপরতা অব্যাহতভাবে চলতে থাকে।

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখি, খৃষ্টানরা যেখানেই গেছে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে আর সমাজের বঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা-উপকরণ সরবরাহ করেছে। হাসপাতাল স্থাপন, ঋণসুবিধা, ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্তদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ এবং দরিদ্রতা বিমোচনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। নারীদের ক্ষমতায়ন তাদের অন্যতম শ্লোগান আজ। তবে খৃষ্টধর্ম প্রচারই তাদের মূল লক্ষ্য। যা সেবার ছলনায় শুরু থেকেই তারা বাস্তবায়ন করে আসছে।

১৬ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এখানে বিভিন্ন স্থানে (যেমন, কিশোরগঞ্জের হোসেনপুরে) ক্যাথলিকরা বসবাস করত। তবে ২০ শতকের শুরুতেই গারোদের মধ্যে উল্লেখযোগ্যহারে ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার শুরু হয়। যা চার্চের ইতিহাসে একটি আলোকজ্জ্বল অধ্যায় হয়ে আছে। ১৯১১ সালের ১৯ মার্চে তুশালপাড়ায় ২১ জন ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত ব্যক্তি ছিল। ১৯১২ সালে এখানেই গারোদের মধ্যে প্রথম গীর্জা নির্মিত হয়। পরবর্তী ২৫ বছরে এ এলাকার মোট ছয়টি প্যারিশ (যাজকীয় এলাকা) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো। ময়মনসিংহ বিশপের এলাকার প্রতিষ্ঠার সময় প্যারিশের সংখ্যা ছিল আটটি। যা ক্রমান্বয়ে ২০০৭ এ এগারোটি এবং ২০১১ তে চৌদ্দটিতে উন্নীত হয়।

বর্তমানে ময়মনসিংহ বিশপের এলাকার এখতিয়ারভুক্ত সিভিল জেলাসমূহ হলো:- ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোণা, সুনামগঞ্জ, শেরপুর, জামালপুর ও টাঙ্গাইল। এতে ক্যাথলিক: ৭৬,০৪৭ জন।

তারপর ১৯২৭ খৃ. ঢাকার পর চট্টগ্রামেও পাদ্রীরা বসতি স্থাপন করে। এরপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন স্থানে বসতি ও চার্চ স্থাপন করে।

১৯২৭ সালের ২৫ মে তৎকালীন ঢাকা বিশপের এলাকার অন্তর্গত প্রায় অর্ধেক অঞ্চল নিয়ে চট্টগ্রাম বিশপের এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যাজকীয় এলাকা হিসেবে অনুমোদন লাভ করে।

১৯২৭ সালে চট্টগ্রাম ঢাকা থেকে পৃথক হয়। উনিশ শতকব্যাপী ব্যান্ডেল গির্জা শিক্ষাসংক্রান্ত ধর্মপ্রচার চালিয়ে যেতে থাকে, যদিও কোম্পানির সরকার ১৭৯৭ সালে ফরমানটি বাতিল করে। ১৯২৮ সালে ব্যান্ডেল গির্জাকে ডন বস্কোর সেইন্ট ফ্রান্সিস দি স্যালেসের অনুগামী রোমান ক্যাথলিক দলের নিকট ন্যস্ত করা হয়। উপনিবেশিক আমল ও তারও পরবর্তী সময়ে এটা বাংলার বিভিন্ন অংশে ডন বস্কো স্কুলের বিভিন্ন শাখা, অক্সিলিয়াম কনভেন্ট ও সেইন্ট পল'স স্কুল প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু বাংলায় ব্রিটিশ (প্রোটেস্ট্যান্ট) ক্ষমতার আর্বিভাবের সাথে সাথে রোমান ক্যাথলিক ধর্মপ্রচার কাজ অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে এবং প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মপ্রচারকগণ প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকেন।

১৯২৭ সালে সমগ্র উত্তরবঙ্গকে নিয়ে "দিনাজপুর বিশপের এলাকা" প্রতিষ্ঠিত হয়।

তবে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভের সময়ও ঢাকা, কলকাতা কেন্দ্রীয় বিশপের এলাকার অন্তর্গত ছিলো। ১৯৪৭ সনে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটলেও মিশনারীরা থেকে যায়। কিছু দিন সংযম ও শালীনতার দীক্ষা গ্রহণ করে। প্রভাব বিস্তারের পরিবর্তে মানবসেবক ও মানবহিতাকাঙ্খী রূপে ময়দানে আসে। পূর্বেই ইংরেজ সরকার বেকারত্ব সৃষ্টি করে মানুষকে দারিদ্রের কশাঘাতে পরাজিত করে রেখে ছিলো । এই দূর্বলতা কাজে লাগিয়ে তারা সুচিন্তিতভাবে মানব সেবায় নেমে পরে। যা ছিলো দাওয়াতী কৌশলে অনেকটাই নতুন রূপ। প্রথমে ছিলো ব্যবসা ও শাসন, এখন রূপ নিল সেবার।

লেভেল সেবা হলেও মতলব অন্য কিছু । তাই যেকোনো ব্যক্তিকে তারা সেবা দিতে প্রস্তুত নয়। বরং যেখানে স্বার্থের আলো দেখে সেখানেই বসায় বিষাক্ত সেবার ছোবল। তারা সাধারণত এমন মানুষ খুঁজে বেড়ায় যে ঋণ গ্রহণ করেছে কিন্তু পরিশোধ করতে অপারগ। অথবা অসুস্থ ও রোগপীড়িত ব্যক্তি যে অর্থের অভাবে চিকিৎসা করতে পারছে না। তারা এ ধরনের অভাবী অসচ্ছল লোকদের শিকার করে থাকে। এদেরকে

সহজেই সেবা দিতে আগ্রহী। যাতে করে সাহায্য, সহযোগিতা এবং পাশে দাড়াঁনোর নামে তাদেরকে খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করা যায়। অনেকেই তাদের সেবার ধোঁকায় পড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে। কেউ সরাসরি গ্রহণ করতে না চাইলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিজেদের আয়ত্তে আনার চেষ্টা করে। জৌলুশপূর্ণ অফিসে নিয়ে এসে খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন ভিডিও দেখায়। ভাল ভাল খাবার পরিবেশন করে। মাঝে মাঝে বাড়িতে গিয়ে খোঁজ নেয়া হয়। বঙ্গবাসীদের খ্রিস্টধর্ম বোঝানোর জন্য তারা বাংলা ভাষা চর্চা করে, (বঙ্গদেশে বাংলা ভাষায় বাইবেল শিক্ষা ও খৃস্টীয় কৃষ্টি-আদর্শ প্রচারের জন্য অনেকেই বাংলা ভাষা চর্চা করেছেন। তাদের মাঝে ড. উইলিয়াম কেরি, ড. টমাস, আলফ্রেড রবিন উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ শাসনামলে সিলেটের চা-বাগান এলাকার ক্যাথলিক, খাসিয়া এবং আদিবাসী মান্দিরা আসামের (ভারত) একটি প্যারিশের তত্ত্বাবধানে ছিলো। ১৯৪৭ এ ভারত বিভাগের পর গোটা সিলেট অঞ্চল ঢাকা কেন্দ্রীয় বিশপের এলাকার অধীনে ছিলো। ১৯৫০ এর পর শ্রীমঙ্গল ও মোগাইপুরে দুটি প্যারিশ প্রতিষ্ঠিত হয়, যার অধীনে ছিল একটি বিশাল ভূখন্ড। ১৯৭৯ খৃ. অবলেটে মিশনারীরা বৃহত্তর সিলেটে আগমন করে। তারা বিভিন্ন স্থানে ধর্মপ্রচারের কাজে নিয়োজিত হয় এবং পর্যায়ক্রমে ১৯৭৫, ১৯৮১, ২০০২, ২০১০ এ বিভিন্ন স্থানে প্যারিশ/মিশন সেন্টার স্থাপন করে। বর্তমানে এ এলাকায় ৭টি প্যারিশ রয়েছে।

২০১১ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর পোপ ষোড়শ বেনডিক্ট সিলেটকে বিশপের এলাকা হিসেবে ঘোষণা প্রদান করে।

সিলেট খ্রিস্টান ধর্মপ্রদেশের এরিয়াতে সিভিল জেলাগুলো হলো- সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ এবং মৌলভি বাজার। এতে ক্যাথলিক: ১৬,৭০৭ জন। এভাবেই মিশনরীরা গ্রাস করেছে আমাদের দেশকে!

১৯৫০ সালের জুলাই মাসে ঢাকার নতুন যাজকীয় প্রদেশ গঠিত হলে চট্টগ্রামের বিশপের এলাকাও তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৫২ খৃ. চট্টগ্রামের বিশপের এলাকার আসাম (ভারত) অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি পৃথক যাজকীয় ইউনিটের রূপ লাভ করে। যা বর্তমানে আগরতলা ও আইজোয়াল বিশপের এলাকা হিসেবে পরিচিত। ঢাকা ধর্মপ্রদেশের প্রধানবিশপের এলাকার এখতিয়ারভুক্ত সিভিল জেলাসমূহ হলো- গাজীপুর, মানিকগঞ্জ, নরসিন্দি, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা, বিবাড়িয়া এবং চাঁদপুর। এ জেলাগুলোতে ক্যাথলিক রয়েছে ৬৮,৪৫৫ জন।

১৯৫২ সালের ৩ জানুয়ারী কলকাতা কেন্দ্রীয় বিশপের এলাকা, কৃষ্ণনগর বিশপের এলাকা এবং বর্তমান খুলনা বিশপের এলাকা নিয়ে যশোর বিশপের এলাকা গঠিত হয়। ১৯২৭ থেকে ১৯৫২ পর্যন্ত সালোসিয়ান মিশনারীরা এখানে কাজ করে। এ এলাকার অন্তর্গত সাতক্ষীরা প্যারিশ ১৯১৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত কলকাতার জেসুইটদের অধীনে ছিলো। ১৯৫৬ সালের ১৪ জুন এপিসকোপাল সী যশোর থেকে খুলনা বৃহত্তর শহরে স্থানান্তরিত হলে এ অঞ্চল খুলনা বিশপের এলাকা হিসেবে অনুমোদন লাভ করে। সাতক্ষীরা শহর থেকে পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে ইসওয়ারিপুরে "খ্রিস্টান পবিত্র গীর্জা" নামে প্রথম খ্রিস্টান গীর্জা নির্মিত হয়। বর্তমানে এই চার্চের কিছুই অবশিষ্ট নেই। তারপর ক্রমান্বয়ে ১৮৫৬, ১৮৫৯, ১৮৭০, ১৮৭৩ সালে মিশনারীরা বিভিন্ন স্থানে গীর্জাসমূহ স্থাপন করে।

বর্তমানে খুলনা বিশপের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার সিভিল জেলাসমূহ হলো- খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, কুষ্টিয়া, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, যশোর, ঝিনাইদহ, নড়াইল, মাগুরা, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ (একাংশ)। এতে ক্যাথলিক রয়েছে ৩৫,১৫২ জন।

মি. কেরি (মাসিক তরজুমানুল কুরআন, লাহোর, মার্চ,১৯৬১) বাইবেলকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে বিতারণ করে। এগুলো সবই তাদের অপকৌশল।

সেবার নামে প্রতারণা কতটা নিচুতা ও মানবতা বিরোধী তা বোঝানোর অপেক্ষা রাখে না। হযরত শামসুল হক ফরীদপুরী রহ. 'পাদ্রীদের ফাঁকি' শিরোনামে বলেছেন- মানুষের দুঃখের সময়, অভাবের সময়, নিষ্পেষণের সময়, যে তার মূল্যবান বস্তু কম দামে সুযোগ পাইবে বা অবোধ ছেলেদের ফাঁকি দিয়া, বিস্কুট দিয়া তাদের কাছ থেকে তাদের সোনার গিনি অলঙ্কার অর্থাৎ ঈমান খসাইয়া, হরণ করিয়া নেয় এর চেয়ে মানবতার দুশমন আর কে আছে ?

মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব, ফরিদপুরী রহ. এর জীবনী গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "পাকিস্তান আমলেই এদেশে খ্রিস্টান পাদ্রীদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। নৈতিক ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে খ্রিস্টান মিশনারীরা তাদের জাল বিস্তার করতে তৎপর হয়।

পাদ্রী 'পায়ার'র শান্তি দ্বীপের নামে খ্রিস্টানধর্ম প্রচারে উদ্যোগী হলে আইয়ুব সরকার তাকে সাহায্য করে। হযরত মাওলানা এ অপতৎপরতার বিরুদ্ধে 'খাদেমুল ইসলাম জামায়াত'র শাখা সংগঠন হিসেবে 'আঞ্জুমানে তাবলীগুল কোরআন' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে পাদ্রী

‘পায়ার’র বিরুদ্ধে খাদেমুল ইসলামের প্রচার সম্পাদক জনাব মাওলানা ফজলুর রহমানের নেতৃত্বে একটি ওয়াফদ পাঠান এবং অল্পদিনে পাদ্রীকে দেশ ছাড়া করেন।” (আল্লামা শামছুল হক রহ. এর জীবনী পৃ. ১১৪)

৭১ এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশে ৩০,০০০ এনজিও কাজ করে যাচ্ছে। এই এনজিওরা কোটি কোটি টাকা খরচ করে। প্রশ্ন জাগে, এই টাকা দেয় কারা ? তাদের তো টাকশাল নেই, তারা টাকা বানায় না। বিশ্বের বড় বড় ধনকুবেররা ইয়াহুদি ও খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। আর কোন ধনকুবের বরং সাধারণ সম্পদশালীও তার অর্থ বেকার খরচ করে না। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মুসলমানদের খৃষ্টান বানানোর জন্য তারা কোটি কোটি টাকা খৃষ্টান মিশনারিতে দেয়।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাদের মিশন নতুন গতি লাভ করে । বিশেষ করে ৭১ এর পর যখন ঘরে ঘরে দূর্ভিক্ষ ছিল। তারা এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসেবে বেছে নেয়। সেবার নামে বিভিন্ন এন. জি. ও. চালু করে মানুষকে কৌশলে আরো দারিদ্রপীড়িত করে ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্র মসৃন করতে থাকে।

কবি আফজাল সাহেব ‘বার্নাবাস বাইবেল’র ভূমিকায় লিখেছেন – ‘ভারতসহ পাশ্চাত্য-দুনিয়ার বিভিন্ন সক্রিয় মিশন ৭১-সালের স্বাধীনতা যুদ্ধকে আমাদের জনগণের ইসলাম পরিত্যাগের উপাত্ত হিসেবে ঠাহর করে বসেছিলো। ফলে আমাদের ধর্মান্তকরণের দুরাকাঙ্খায় তারা গোপন ব্লুপ্রিন্টসহ সরাসরি মাঠে নেমে আসলেন। সত্তরের দশকটিতে তারা প্রচুর মিশনারী পাঠিয়েছেন এবং প্রভূত অর্থ ঢেলেছেন একাজে। বহু নতুন মিশনারী স্থাপিত হয়েছে বিভিন্ন স্থানে। বিদ্যমান মিশনগুলির সম্প্রসারণ ও শক্তি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

কমপক্ষে চারশত বিভিন্ন নামের খ্রিস্টান, ইহুদী ও হিন্দু সেবামূলক প্রতিষ্ঠান আমাদের দারিদ্র্য, অশিক্ষা ও নির্বিকারচিত্ততার সুযোগ নিয়ে প্রচুর অর্থ ও জনসম্পদসহ ধর্মান্তকরণের প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত। ফলে বৃটিশ-রাজত্বকালের মুনশী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ ও জমির উদ্দীনের দুঃসময়ের তুলনায়, হালের দুঃসময়ের মাত্রাটি কোনোভাবেই তো কম কিছু নয়।’(বার্নাবাসের বাইবেল; আফজাল চৌধুরী অনূদিত, পৃ. ৯-১১)।

দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ খৃ. ২৫ মে চট্টগ্রামে খ্রিস্টধর্ম প্রদেশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রধান বিশপের শাসনাধীনে চট্টগ্রামসহ ১৭টি সিভিল জেলা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যথা- কক্সবাজার, বান্দরবান, রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, ফেনী, লক্ষীপুর, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরিশাল, ঝালকাটি, বরগুনা, গোপালগঞ্জ, মাদারিপুর এবং শরিয়তপুর। এতে ক্যাথলিক রয়েছে ৪০,৫৯৬ জন।

১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে পাবনা জেলা এবং তার অন্তর্গত মথুরাপুর প্যারিশ (স্থানীয় যাজকীয় এলাকা, যার নিজস্ব গীর্জা আছে) ঢাকা থেকে দিনাজপুরের বিশপের এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। ফলে যমুনা ও গঙ্গার তীর জুড়ে গোটা রাজশাহী বিভাগ নিয়ে দিনাজপুর বিশপের এলাকা গড়ে ওঠে। ১৯৯০ সালের মে মাসে এ এলাকার দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে রাজশাহীর নতুন বিশপের এলাকা গঠিত হয়।

বর্তমানে দিনাজপুরের বিশপের এখতিয়ারভুক্ত এলাকার সিভিল জেলাসমূহ হলো- দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, রংপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা ও জয়পুরহটের পঞ্চবিবি উপজেলা। এতে ক্যাথলিক রয়েছে ৫৪,০৮২ জন।

১৯৭৮ সালে উত্তর আমেরিকার লুওয়াজিন নামক স্থানে সমকালীন খৃষ্টবাদ প্রচারের ধারাবাহিকতায় এক ঐতিহাসিক কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়। তাতে সারা দুনিয়ার প্রায় দেড়শ প্রথম সারির খৃষ্টান ধর্মগুরু ও ধর্মনেতাগণ যোগদান করেন। তাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন দেশের বড় বড় গির্জা, মিশনারি প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। উক্ত কনফারেন্সে অংশগ্রহণকারী সবাই নিজ নিজ অভিজ্ঞতা, জ্ঞান-গবেষণা এবং বোধ ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে মুসলমানদের মাঝে খৃষ্টবাদ প্রচারের স্বার্থে এ ব্যাপারে অত্যধিক গুরুত্বারোপ করেন যে, দাওয়াতি কার্যক্রম পরিচালনার সময় যদি তাৎক্ষণিকভাবে মুসলমানদেরকে খৃষ্টবাদের বিষাক্ত ট্যাবলেট গলধকরণ করানো নাও যায় তাহলে সমস্যা নেই; কিন্তু কমপক্ষে অতি অবশ্যই মুসলমানদের মাঝে নৈতিক ও চারিত্রিক স্খলন ঘটানো এবং ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদেরকে পঙ্গু করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে যেতে হবে। কনফারেন্সে যোগদানকারী ধর্মনেতাগণ এ প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি রিসার্চ ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠার দাবী জানান। যা পরবর্তীতে একজন প্রসিদ্ধ উগ্র ও চরমপন্থী খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক স্যামুয়েল জেইমারের নামে পরিচিতি লাভ করে।

আন্তর্জাতিক খ্রিষ্টান মিশনারী গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খ্রিষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। শুধুমাত্র ১৯৯৬ সালের এক বছর সময়েই খৃষ্টানরা সারা দুনিয়ায় বাইবেলের ২৮ বিলিয়ন কপি (আঠারশত কোটি কপি) বিতরণ করেছে। আর এ কথা শুনলে তো রীতিমত অবাক হতে

হয় যে, গেলো বছর পর্যন্ত পৃথিবীর নামী-দামী বড় বড় লাইব্রেরীগুলোতে যীশু খৃষ্টের নামে লেখা বই-পত্রের সংখ্যা ৬৫৭৫১ এ দাঁড়িয়েছে। এগুলোর মধ্যে ৫৩০৯৪ টি বইয়ের প্রচ্ছদে উজ্জ্বল ও স্পষ্ট অক্ষরে যীশু খৃষ্টের নাম লেখা আছে।’’

মিশনারী সূত্র মতে, এর ফল হিসাবে বর্তমান শতকের প্রথম সাত দশকে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ ৯০ হাজার লোক খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশে এর জরিপ খুবই উদ্বেগজনক। ১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খ্রিষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খ্রিষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারীতে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৫০ লাখে। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খ্রিষ্টান জনসংখ্যা ১ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বর্তমানে তার পরিসংখ্যান যে আরো অনেক গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

এন.জি.ও প্রশিক্ষণের নামে তাদের মিশনারীর প্রশিক্ষণের জন্য ১৯৬৯ সালে ভারতে ও সিংগাপুরে ‘হ্যাগাই ইনস্টিটিউশন’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য তারা লক্ষ লক্ষ ধর্ম প্রচারককে প্রশিক্ষণ দিয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। ১৯৮৫ সালে প্রায় আড়াই লক্ষ পশ্চিমা ধর্ম প্রচারক ৩৫০০টি পশ্চিমা মিশনারী সংস্থার প্রতিনিধি হিসাবে এশিয়া ও আফ্রিকায় সক্রিয় ছিল। তাদের সহযোগী হিসাবে ছিল ৩৫ লক্ষ স্থানীয় ধর্ম প্রচারক। ১৯৮৫ সালে সারা বিশ্বে মিশনারীদের পরিচালিত রেডিও টিভির স্টেশনের সংখ্যা ছিল ১৫৮০ টি এবং সম্ভাব্য সব ভাষায় নিয়মিত প্রকাশিত সাময়িকী সংখ্যা ছিল ২১,০০০।

১৯৯০ সালের ২১ মে বৃহত্তর দিনাজপুর বিশপের এলাকার দক্ষিণাংশ নিয়ে রাজশাহী বিশপের এলাকা গঠিত হয়। তাই ধর্মপ্রদেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবার পূর্বে এ এলাকার ইতিহাস দিনাজপুরের বিশপের এলাকার সাথে সংশ্লিষ্ট।

একজন মুন্ডা উপজাতীয় খ্রিস্টান ধর্মপ্রচারকের আবেদনের ভিত্তিতে ১৯০২ সালের ২৯ জানুয়ারী ফ্রান্সিসকো রোকা এখানে আসেন এবং খৃস্টের সুসমাচার প্রচার অব্যাহত রাখতে উক্ত খ্রিস্টান আদিবাসী ও তার পরিবারকে সাহায্য করেন। তার আগমনের আট বছরের মধ্যেই এখানে মুন্ডাদের মধ্যে কয়েকটি খ্রিস্টান সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। ক্রমবর্ধিষ্ণু মিশনারী কার্যক্রমের ফলে আদিবাসীদের মধ্যে ক্যাথলিক বিশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৫ সালের পর আগন্তুক বাঙ্গালী খ্রিস্টানদের আশ্রয় ও বিভিন্ন প্রয়োজনের নিমিত্ত তিনটি প্যারিশ স্থাপিত হয়।

উত্তরবঙ্গে চার্চের কার্যক্রমের পরিধি বিস্তৃত ও প্রসারিত হওয়ার কারণে একটি নতুন বিশপীয় এলাকা প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছিল। ১৯৯০ সালের ২১ মে দিনাজপুর বিশপীয় অঞ্চলের দক্ষিণের আটটি জেলা নিয়ে রাজশাহী বিশপীয় এলাকা প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে রাজশাহীর বিশপের এলাকার অন্তর্ভুক্ত সিভিল জেলাসমূহ হলো:- রাজশাহী, নাটোর, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, চাপাইনবাবগঞ্জ, নওগাঁ ও জয়পুরহাট (পাঁচবিবি থানা বাদে)। এতে ক্যাথলিক রয়েছে ৫৯,৬৩০ জন।

মিশনারী তৎপরতার একটি সহযোগী মিশন হল এন.জি.ও। এর মাধ্যমে তারা দারিদ্র্য ও অনুন্নত মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে জাল বিস্তার করেছে। বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে তথা প্রত্যন্ত অঞ্চলে খ্রিষ্টান মিশনারীদের ছত্রছায়ায় হাজার হাজার এন.জি.ও ছড়িয়ে পড়েছে। যেমন, কারিতাস, ব্র্যাক, সালভেশন আর্মি, সংগ্রাম, নারী স্বনির্ভর পরিষদ, আশা, ব্যপ্টিষ্ট এইড মিশন, মিশনারীজ অব চ্যারিটি, ডেনিশ বাংলাদেশ, প্রশিখা, এডাব, নিজেরা করি, বাঁচতে শেখা, দীপশেখা, গণউন্নয়ন সংস্থা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে রেজিস্ট্রিকৃত বর্তমানে এন.জি.ওদের সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। তন্মধ্যে ৬৩২ টি সরাসরি বিদেশী সহযোগিতায় পরিচালিত। বাকীগুলো বিদেশীদের এজেন্ট হিসাবে কাজ করছে। এজন্য তারা আমাদের দেশকে ৬ টি প্রদেশে বিভক্ত করেছে। যথা : (১) দিনাজপুর (২) রাজশাহী (৩) খুলনা (৪) চট্টগ্রাম (৫) ঢাকা এবং (৬) ময়মনসিংহ। তারা বিশেষ করে দু’টি কাজ কৌশলে করে যাচ্ছে- (ক) ইসলাম ধর্মের আদর্শিক ভিত্তি সম্পর্কে শিক্ষিত ও স্বল্প শিক্ষিত মানুষকে ভুল তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত করা। (খ) ইসলামী অনুশীলন ও সংস্কৃতি ধ্বংস করা। এছাড়া সূক্ষ্মভাবে রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য উস্কে দিয়ে দেশ দখলের পাঁয়তারা করা। তারা তাদের ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন করে, মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা ব্যবহার করে, নকল ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার করে এবং পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা করে সহজ-সরল মুসলিমদেরকে ধোঁকা দিচ্ছে। এমনকি মসজিদেও নকল ইমাম নিয়োগ দিচ্ছে এবং যুবতী মেয়েদের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারে অপতৎপরতা চালাচ্ছে। যারা এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচার করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল, ড. ইউলিয়াম কেরী, মাদার তেরেসা, ড. টমাস, ফাদার টর্সবার্লার, টর্বেন্ডে পিটারসন, আলফ্রেড বরীন মণ্ডল, ড. অলসন প্রমুখ।

দেশের প্রায় অধিকাংশ জেলাতে তারা মিশনারী স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছে। উক্ত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খ্রিষ্টের বই, যীশু খ্রিষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ানো হচ্ছে। ছোটদেরকে ‘সিবগাতুল্লাহ’ নামের একটি বই পড়ানো হয়, যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের

পাঠদান করে ছোট বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল ও সীমান্ত এলাকার উপজাতীয়দের মধ্যে মিশনারী কাজ করে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। তাতে অচিরেই এদেশের সকল উপজাতি খ্রিষ্টানদেরকে পার্বত্য অঞ্চলে একত্রিত করে পৃথক একটি খ্রিষ্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবী তুলতে পারে।

অতএব এদেশের স্বাধীনচেতা মানুষ বিশেষ করে মুসলিমরা যদি এ ব্যাপারে সচেতন না হয়, তাহলে অল্প সময়ের মধ্যে মিশনারীদের লক্ষ্য বাস্তবায়নে আরো এগিয়ে যাবে এবং গভীর ষড়যন্ত্রের শিকড় আরো শক্ত করবে; সাথে সাথে ইসলাম ও বাংলাদেশের জাতিসত্তা, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব হুমকির মুখে পড়বে। অতএব খ্রিষ্টান মিশনারীদের তৎপরতা সম্পর্কে জাতিকে সতর্ক হতে হবে এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়ন করে তাদের অপতৎপরতাকে রুখে দিতে হবে। এ জন্য দেশের আলিম সমাজ, শিক্ষক, লেখক, মিডিয়া কর্মী, রাজনীতিবিদ, ব্যবসায়ী-বিত্তবান, সরকার প্রধানসহ সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। বিশেষ করে সকল মুসলিমকে নির্ভেজাল তাওহীদী চেতনায় ঐক্যবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহাই হোন-আমীন!!

এভাবে আজ বাংলাদেশ ছেয়ে গেছে খ্রিস্টান মিশনারী দিয়ে। ধর্ম প্রচারের সুবিধার্থে তারা পুরো দেশকে বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশে ভাগ করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশে এ ধরণের ৭টি ধর্মপ্রদেশ রয়েছে। (প্রদেশগুলোর বিবরণের জন্য দ্রষ্টব্য : The Catholic Directory Of Bangladesh 2011, The Catholic Directory Of Bangladesh 2015 Ges Christian Communication Center Catholic Directory)

১. Archdiocese of Dhaka (ঢাকা খৃস্টীয় প্রধান বিশপের শাসনাধীন সর্বপ্রধান এলাকা)

২. Diocese of Chittagong (চট্টগ্রাম বিশপ-শাসনাধীন প্রদেশ)

৩. Diocese of Dinajpur (দিনাজপুর বিশপ-শাসনাধীন প্রদেশ)

8. Diocese of Khulna (খুলনা বিশপ-শাসনাধীন প্রদেশ)

৫. Diocese of Mymensingh (ময়মনসিংহ বিশপ-শাসনাধীন প্রদেশ)

৬. Diocese of Rajshai (রাজশাহী বিশপ-শাসনাধীন প্রদেশ)

৭. Diocese of Sylhet (সিলেট বিশপ-শাসনাধীন প্রদেশ)

যে সমস্ত এনজিও সেবার নামে সরাসরি ধর্ম প্রচার করছে অসহায়, নিরক্ষর মানুষকে সেবা দেওয়ার নামে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করতে যে সংস্থাগুলো উল্লেখযোগ্য তৎপরতা চালাচ্ছে তার মধ্যে কিছু হলো [৪]–

(১) কারিতাস, (২) এন.সি.সি. (ননলাইট সেন্ট্রাল কমিটি), (৩) লুথারান মিশন, (৪) দ্বীপশিখা, (৫) সালভেশন আর্মি, (৬) ওয়ার্ল্ড ভিশন, (৭) সি.ডি.এস. (সেন্ট্রাল ফর ডেভেলপম্যান্ট সার্ভিস), (৮) আর.ডি.আর.এস. (রংপুর দিনাজপুর রোড এন্ড সার্কেল), (৯) সি.সি.ডি.ভি. (খৃষ্টান কমিশন অফ ডেভেলপম্যান্ট), (১০) হিড বাংলাদেশ, (১১) সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট, (১২) চার্চ অফ বাংলাদেশ, (১৩) পের ইন্টারন্যাশনাল, (১৪) সুইডিশ ফ্রেমিশন, (১৫) কনসার্ন, (১৬) এডরা, (১৭) অস্ট্রেলিয়ান ব্যাপটিস্ট সোসাইটি, (১৮) এমসিনি, (১৯) ওয়াই.ডব্লিউ.সি. (২০) ফেমিলিজ ফর চিলড্রেন, (২১) আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট ইত্যাদি।

এসব সংস্থা বাজেটের ৯০ ভাগ খৃষ্টানদের অথবা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হওয়ার সম্ভাবনায়ময় ব্যক্তিদের পিছনে ব্যয় করে থাকে।

গ। এনজিওদের কার্যক্রম

১। চার্চ অফ বাংলাদেশ

ডঃ জিগা বি. আলসেনের পরিচালনায় “চার্চ অফ বাংলাদেশ” নামে একটি খৃষ্টান মিশনারি এনজিও “মৌলবাদী এনজিও”, ১৯৬৫ সালে কক্সবাজারের মালুমঘাটে “মেমোরিয়াল হসপিটাল” নামে একটি খৃষ্টান হাসপাতাল তৈরি করে। এলাকার লোকজন ছিল অভাবগ্রস্ত ও নিরক্ষর। এই সুযোগে ড. ভিগা বি আলসেন তার প্রতিষ্ঠিত হাসপাতালে সেবাদানের মাধ্যমে ৩৮ বছর এই মালুমঘাটের চকরিয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে থাকেন। ১৯৬৪ সালে মালুমঘাটে যেখানে একজনও খৃষ্টান ছিল না, তার প্রচেষ্টায় ২০০৩ সালে সেখানে খৃষ্টানদের সংখ্যা ৪০ হাজারে উন্নীত

হয়েছে। তারা আশেপাশের জমি ক্রয় করে নয়া খৃষ্টানদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করেছে। অন্যদিকে চট্টগ্রামের দৌলতপুরে মরিয়াম আশ্রমের পাশে তারা বিশাল খৃষ্টান এলাকা গড়ে তুলেছে। সেখানে দুর্গম এলাকায় পাহাড়ের ভিতরে তারা গির্জা নির্মাণ করেছে।

২। সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট

এই "সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্ট" খৃষ্টান মিশনারি তাদের সহযোগীদের মাধ্যমে ৮৫ টি প্রাইমারী স্কুল, মাধ্যমিক স্কুল পরিচালনা করে। এসব স্কুলে কোন মুসলমানের সন্তান ভর্তি নেওয়া হয় না। ১৯৯০-৯১ সনে এই "সেভেন ডে চার্চ" ২৩০ মিলিয়ন টাকা খরচ করে বহু মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে।

৩। হিড বাংলাদেশ

"হিড বাংলাদেশ" নামে এ এনজিও মৌলভী বাজারে, কমলগঞ্জে, সুন্দরবনে সেবার আড়ালে খৃষ্টধর্ম প্রচার করে যাচ্ছে। সূচনাতেই তারা ৬ লক্ষ মার্কিন ডলার নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে।

৪। সি. সি. ডি. ভি.

"সি. সি. ডি. ভি." নামক সংস্থা রংপুর, দিনাজপুরসহ উত্তরবঙ্গের জেলাগুলোতে কাজ করছে। আর "ডি.আর. আর. এস." এর সমস্ত সংগঠন টাকা নেয় সুইডেন, ডেনমার্ক, ইংল্যান্ড থেকে। টাকা আনে মিস্টার টরবেন পিটারসের নেতৃত্বে ১৯৮৬ সালে ২১৮ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা ব্যয় করে বৃহত্তর দিনাজপুর, রংপুর অঞ্চলে সাঁওতাল উপজাতিদেরকে দাওয়াত দিয়ে ৩৫ হাজার সাঁওতালকে তারা খৃষ্টান বানিয়েছে।

ঘ। খৃষ্টান বানানোর কৌশল [৪]

কৌশল ১ – যশোরে ফাতেমা নামক একটি হাসপাতাল আছে। প্রতিদিন সে হাসপাতালে প্রায় ছয়শত মুসলমান চিকিৎসা নেওয়ার জন্য যায়। আর এ সুযোগে তারা ধর্মান্তরে আকৃষ্ট করার চাতুরীপূর্ণ কৌশল অবলম্বন করে। জনৈক রোগীর ঘটনা, সে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে গেলো। কর্তব্যরত নার্স তাকে তাকে একটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, এটা আল্লাহ'র নাম নিয়ে খেয়ো। সরল মহিলা সেবিকার পরামর্শ অনুসারে ঔষধ সেবন করলো বটে, কিন্তু রোগ সারলো না। পরদিন আবার গেলে তাকে আরেকটি ঔষধের পোটলা দিয়ে বললো, যীশুর নামে খেয়ে দেখো সারে কিনা। এবার ঔষধ সেবনে তার রোগ সারলো। (মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ে সঠিক ঔষধ দিয়েছিলো) এভাবে প্রহসনের মাধ্যমে দেশের সরলপ্রাণ আত্মভোলা মুসলমানদের বিভ্রান্ত করছে মিশনারিরা।

কৌশল ২ – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর এনজিওদের দ্বারা দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হাজার হাজার প্রাথমিক স্কুল। নিরক্ষরতা দূরীকরণ শ্লোগানের আড়ালে সেখানে কোমলমতি শিশুদের মনে খৃষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির নিরন্তর প্রয়াস চালানো হচ্ছে। যেমন – খৃষ্টান মিশনারিগুলোর অনুদাননির্ভর একটি এনজিও দ্বারা প্রতিষ্ঠিত স্কুলে জনৈক শিক্ষিকা ছাত্রদের বললেন, বাড়িতে তোমাদের আব্বু-আম্মু তোমাদের বেশী ভালোবাসেন, না তোমাদের বাড়ির সেবকদের (কাজের লোকদের)। উত্তরে কোমলমতি শিশুরা বললো – বাবা-মা আমাদের বেশী ভালোবাসেন। তখন শিক্ষিকা বললেন – তোমাদের বাবা-মা তোমাদের স্নেহ করেন এজন্য যে, তোমরা তাদের সন্তান। তেমনই খৃস্টধর্মের প্রবর্তক যীশু হলেন আল্লাহ'র পুত্র, আর মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হলেন আল্লাহ'র বান্দা ও দাস। এখন বলো, পুত্র হিসেবে আল্লাহ যীশুকে বেশী ভালোবাসেন, না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'কে ?

মুসলমানের সন্তান নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে চিনে না, মেরী ও যীশুকে চিনে !

বারিধারা নতুন বাজারের পিছনে একটি বড় বস্তি আছে। একদিন বিকালে বন্ধুবর মাওলানা মুজিব সাহেবসহ ঐ এলাকায় ঘুরছিলাম। চোখের সামনে পড়লো একটি স্কুল, সাথে গির্জা। স্কুলটি দেখে আমাদের কৌতূহল হলো।

স্কুলের সামনে ১০ / ১২ বছর বয়সের কয়েকটি ছেলে খেলাধুলা করছে। একজনকে তার নাম জিজ্ঞেস করলে "রাকিবুল ইসলাম" বলে উত্তর দিলো এবং এও জানতে পারলাম যে, সে এই স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়াশুনা করে। তাকে কালেমা জিজ্ঞাসা করলে "পারি না" বলে উত্তর দেয়। এবার আমাদের নবীর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নাম জিজ্ঞাসা করলাম। উত্তরে বললো "জানি না"। এবার জিজ্ঞাসা করলাম, তুমি কি মেরী বা যীশুকে চেনো ? সে উত্তর দিলো – হ্যা, চিনি। আবার জিজ্ঞাসা করলাম – কিভাবে চেনো। সে বললো, আমাদের স্যার আমাদের শিখিয়েছেন।

দেখুন, আমাদের উদাসীনতার সুযোগে আমাদের সন্তানদেরকে তারা খৃষ্টান বানাচ্ছে। এটাই হলো তাদের সেবার আসল রূপ।

কৌশল ৩ – খৃষ্টানরা পরিকল্পিতভাবে খৃষ্টধর্মের বর্তমান বিকৃতরূপকে জাগতিক উন্নতি, পরকালের মুক্তির একমাত্র সহজ উপায় হিসেবে উপস্থাপন করছে। তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষের দলীল হিসেবে ঈসা আলাইহিস সালাম সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতসমূহকে পেশ করছে। এতে বিভ্রান্ত হচ্ছে আত্মভোলা সহজ-সরল জনগোষ্ঠী, ধর্মান্তরিত হচ্ছে অনেক মানুষ। যাদের ধর্মান্তর করার জন্য টার্গেট করা হয়, তাদের ধারণা দেওয়া হয় যে, পূর্বের নবীদের উপর ঈমান রাখাও ইসলামের মৌলিক বিধান। এক্ষেত্রে ঈমান হিসেবে ঈমানে মুসাসসালের অংশবিশেষ “নবীদের উপর ঈমান আনয়ন” এর আবশ্যকতার প্রসঙ্গটি উপস্থাপন করা হয় অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে। এ ধরনের প্রচারণার শিকার দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ থানার আমীর হামযা সম্পর্কে জানা যায়, সে নিজেলে ঈসায়ী মুসলমান হিসেবে দাবী করে। তার বক্তব্যের স্বপক্ষে “ঈমানে মুফাসসাল” কালেমার বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করে যুক্তি দেখায় যে, এতে পূর্ববর্তী নবীদের উপর ঈমান আনার কথা বলা হয়েছে এবং তা আবশ্যক, সে নিরিখে সে ঈসায়ী মুসলমান। এ সব ঘটনা বিশ্লেষণে এ বিষয়টি প্রকাশ পায় যে, ধর্মান্তর ঘটানোর জন্য যে কৌশলেরই প্রয়োজন দেখা দিক, সুচতুরভাবে তা প্রয়োগে তার সদা তৎপর থাকে।

কৌশল ৪ – মুসলিমুদ্দিন সানোয়ার নামে এক যুবককে (যিনি খৃষ্টানদের প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন) জিজ্ঞাসা করলাম, কিভাবে তিনি প্রতারণার শিকার হয়েছিলেন। সানোয়ার বললেন, আমি দুইবার মিশনারির প্রতারণার শিকারে পরিণত হয়েছিলাম। প্রথমবার শিকার হয়েছিলাম ১৯৮৭ সালে। বই পাঠে আমার প্রচণ্ড লোভ ছিল। একদিন একটি বইয়ে “পোস্ট বক্স নং” সংযুক্ত একটি ঠিকানা পেলাম। বইটি ছিল খৃষ্টান মিশনারির প্রকাশিত। আগে শুনেছি, খৃষ্টানদের চিঠি-পত্র লিখলে তারা প্রচুর বই পাঠায়। তাই কোন কিছু চিন্তা না করেই ঠিকানা অনুযায়ী পত্র লিখলাম। এর কিছুদিন পরই ডাক মারফত আমার ঠিকানায় বই আসলো, সাথে একটি প্রশ্নপত্র। প্রশ্নপত্রটি দেখে বুঝলাম, বইগুলো পড়ে উত্তর দিতে হবে। হাতে সময় মাত্র সাত দিন। অনেক খুঁজাখুঁজির পর উত্তরগুলো লিখে পাঠালাম। পরবর্তীতে তারা আমার কাছে ডাকে আরো কিছু বই ও প্রশ্নপত্র পাঠালো। তখন আমি এইচ.এস.সি. ১ম বর্ষের ছাত্র। উত্তর লিখে নির্ধারিত বক্স নাম্বারে পাঠানোর পর তারা আবার এক সেট বই, প্রশ্নপত্র, নাম্বার ও সনদপত্র পাঠালো।

তৃতীয়বারের প্রশ্নপত্রের একটি প্রশ্ন দেখে একটু বিব্রতবোধ করলাম। প্রশ্নটি ছিল এরূপ – আপনি কি যীশুকে রিযিকদাতা বলে বিশ্বাস করেন ? আমি জানতাম, এ প্রশ্নের উত্তরে যদি হ্যা বলি, তাহলে আরো বই আসবে, অন্যথায় বই পাঠানোর এ ধারা বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু ঈমানের দাবীকেই আমি অগ্রাধিকার দিয়ে প্রশ্নের উত্তরে “না” লিখে পাঠালাম।

কৌশল ৫ – সেই সানোয়ার দ্বিতীয়বার মিশনারির শিকার হলেন। সানোয়ার বলেন, আমি চাকরি পাওয়ার জন্য একদিন ঢাকায় ১০৫/১৬ মনিপুরী পাড়ায় সিএলবি অফিসের ঠিকানায় উপস্থিত হলাম। পরিচয়পর্বের পর সেখানের এক কর্মকর্তা আমাকে খৃষ্টধর্ম সম্পর্কে বেশ ধারণা দিতে লাগলো এবং বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে তার উক্তিগুলোর যুক্তি দিতে লাগলো। আমি নীরবে তার কথার সায় দিচ্ছিলাম। তার কথার সারমর্ম ছিল, যীশুই এ পৃথিবীর একমাত্র অভিভাবক। যীশুকে ছাড়া আল্লাহ’কে পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়। আমার ইতিবাচক অবস্থাদৃষ্টে “ধর্মান্তর করা যাবে” মর্মে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো। সেদিন অফিস থেকে বের হওয়ার সময় আমাকে ২১/২২ মার্চ ১৯৯৯ ইং সালে ট্রেনিংয়ে যোগদানের জরুরী আহবান জানিয়ে বিদায় নিলো। সম্ভবত ৯ই অক্টোবর ১৯৯৯ ইং সালের ঘটনা – একজন ফাদার আমাকে খৃস্টধর্মের বড়ত্ব সম্পর্কে দীর্ঘক্ষণ বুঝান। এরপর ধ্যানের আসনে বসিয়ে একটি বই থেকে কিছু পড়ালো, তখন আমার চোখ বন্ধ ছিলো। পড়া শেষে আমাকে বলা হলো, আপনি খৃষ্টান হয়ে গেছেন। এরপর খৃষ্টধর্মের স্বার্থকতা ও ইসলামধর্মের অসারতা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলো। এক পর্যায়ে আমাকে বললো – মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যক্তি হিসেবে একজন সাধারণ মানুষ, ইসলামধর্মে তার কৃতিত্ব নেই। একমাত্র যীশুই সমস্ত কিছুর অধিকারী। যীশুর জন্ম না হলে এ পৃথিবীর জন্ম হতো না।

কৌশল ৬ – মুসলমানদের ধোঁকা দেওয়ার একটি বড় কৌশল হলো, মিশনারিতে ধর্মান্তরিত হলেও নাম রাখে মুসলমানদের, যাতে মুসলমানরা বুঝতে না পারে। যেমন, যশোর জেলায় ফাতেমা হাসপাতাল নামে একটি মিশনারি হাসপাতাল আছে। হাসপাতালের প্রবেশমুখে শ্বেতপাথরে খোদিত সুন্দর একটি সিনারী আঁকা, এতে মাদার তেরেসার সদলবলে একটি সাঁকো পার হওয়ার দৃশ্য। ছবির নিচে সুন্দর করে লেখা – যীশু পীড়িত মানুষকে সেবাদানের জন্য এভাবে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। ছবিটি হাসপাতালের প্রবেশ পথের সামনের দেওয়ালে এমনভাবে সাঁটানো যে, যে কোন দর্শনার্থী ও সেবাগ্রহীতা লোকের নজর কাড়ে। হাসপাতালের গেটম্যানের নাম মুহাম্মাদ সৈয়দ, মূলত এই লোকটি খৃষ্টান। তদ্রূপ হাসপাতালের এম. ডি. ও প্রধান ডাক্তারসহ প্রায় সবাই খৃষ্টান হলেও মুসলিম নাম ধারণ করেছে। যেমন, এম. ডি.র নাম মুহাম্মাদ বোখারী।

এই হাসপাতালের পিছনে একটি গির্জা আছে। গির্জা ও হাসপাতালের মাঝামাঝি একটি পার্ক আছে। এ পার্কে টিলার উপর কৃত্রিমভাবে নির্মিত বিশাল আকারের একটি নারীমূর্তি। এর সামনে কয়েকটি নারীমূর্তির হাঁটু গেঁড়ে প্রণাম করার দৃশ্য। কয়েকটি ভেড়া হা করে চেয়ে আছে বিশাল নারী মূর্তিটির দিকে। এর মধ্যে একটি ভেড়া অলস ঝিমুচ্ছে। রোগী ও দর্শনার্থীরা ঘুরে ঘুরে পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলোর লীলা উপভোগ করছে। রোগীদের একঘেয়েমী দূর ও চিত্ত-বিনোদনের জন্য এ ব্যবস্থা। পার্কে স্থাপিত মূর্তিগুলো দেখলে মনে হয় – এগুলো গির্জার মহিমা ফেরি করে বেড়ানোর জন্য রাখা হয়েছে। সে পার্কে মিশনারির নিযুক্ত লোক দর্শনার্থী ও রোগীদের কাছে মূর্তিগুলোর অবস্থা বিশ্লেষণ করে মেরীর মহিমা প্রচার করে। যেমন, দর্শনার্থীদের বা রোগীদের বুঝায় যে, টিলার বড় নারী মূর্তিটি হলো মেরী, যাকে মরিয়ম বলা হয়। আর প্রণামরত ছোট ছোট নারী মূর্তিগুলো হলো স্বর্গীয় দূত, যাদেরকে আপনারা ফেরেশতা বলেন। অর্থাৎ, মেরী কোন একসময় পাহাড়ি অঞ্চল দিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন, তখন স্বর্গীয় দূতেরা তাকে দেখে প্রণাম করছে আর ভেড়াগুলো ঘাস খাওয়া বিরতি দিয়ে মেরীকে দেখছে। একটি ভেড়া বেখেয়ালে ঝিমুচ্ছে। স্থানীয় একজন আলিম জানান, রোগীদের পার্কে ঘুরানোর সময় গির্জার নিযুক্ত লোকেরা চাতুর্যের সাথে মেরীর মূর্তি ও গির্জার প্রতি ভক্তিমূলক ইঙ্গিত-ইশারা করে রোগমুক্তির জন্য প্রার্থনার প্রসঙ্গ তোলে। আর হাসপাতালের দেওয়ালে সাঁটানো যীশুর ছবি, সাঁকো পার হওয়া সংবলিত আর্ট, গ্রামে গ্রামে ঘুরে যীশুর রোগীসেবা ও সংশ্লিষ্ট হাসপাতালের রোগীর বেডের আশেপাশে খৃষ্টধর্মের বিভিন্ন বই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রাখা হয়, যেন অবসর সময়ে রোগী নিজ থেকে বই হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করে। এভাবে সেখানে লোকজনকে ধর্মান্তরে উদ্বুদ্ধ করা হচ্ছে।

৬। প্রতিষ্ঠান, প্রকাশনা ও প্রচার মাধ্যম [8]

১। বিশ্বব্যাপী নেটওয়ার্ক

যদিও প্রচলিত খৃষ্টধর্ম ছিল সেমেটিক অর্থাৎ প্রাচ্যের, কিন্তু বর্তমানে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরাই এর ধারক-বাহক হয়ে বসেছে। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সরকার ও সংস্থার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য সহযোগিতায় খৃষ্টান মিশনারীরা বিশ্ব জুড়ে গড়ে তুলছে খৃষ্টধর্ম প্রচার ও প্রচারের বিস্তৃত নেটওয়ার্ক।

বর্তমানে ৭০ হাজারের বেশী মিশনারি ক্রুসেডার (ধর্ম যোদ্ধার) শিকার মুসলিম বিশ্ব। এ প্রেক্ষিতে তারা পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় গড়ে তুলেছে চার্চ ও বিভিন্ন ছদ্মবেশী সেবা, শিক্ষা ও আর্থিক দাতা প্রতিষ্ঠান "এনজিও" সমূহ।

সরাসরি মিশনারির মধ্যে "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" এমন একটি সংস্থা, যার কাজ হলো ধর্মের অসারতা প্রমাণ ও ইসলামের নবজাগরণকে প্রতিহত করা এবং বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা। এ ব্যাপারে জার্মান, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া ও ভারত থেকে প্রচুর নিষিদ্ধ ও ইসলাম বিরোধী বই এদেশে বহু কথিত বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, নাট্যকর্মী, কণ্ঠশিল্পী এবং প্রগতিবাদীদের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে। "হ্যাগাই ইন্সটিটিউট" ২০০০ অ্যালুমনই (সদস্য) নিয়ে ৫ টি মহাদেশের ৭০ টি প্রদেশে ১,০০,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। ২০০০ সালের মধ্যে ১০ লক্ষ মানুষকে দক্ষ প্রচারকরূপে প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশসহ তৃতীয় বিশ্বে খৃষ্টধর্ম প্রচারের জন্য পাঠাবার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে প্রকাশিত এক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে জানা যায় যে, ১৯৯১ সালে বিশ্বব্যাপী খৃষ্টধর্ম প্রচার ও ইসলামী জাগরণকে প্রতিহত করতে ১,২০,৮৮০ টি প্রতিষ্ঠান ও এজেন্সী প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তার মধ্যে বাংলাদেশে প্রটেস্ট্যান্ট গোত্রের ইয়াং খৃষ্টান ওয়ার্কস এবং এভরী হোম কান্ট্রাস্ট, খৃষ্টান কমিশন ফর ডেভেলপম্যান্ট ইন বাংলাদেশ (সি. সি. ডি. বি.) ইয়াং ম্যানস খৃষ্টান এসোসিয়েশন (ওয়াই. এম. সি.) উল্লেখযোগ্য। তারা বাংলাদেশের নানা স্থানে বিভিন্ন নামে অসংখ্য সংস্থা স্থাপন করেছে। যেমন –

* নুর-ই-ইলাহী, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* খোদার পথ, পোস্টবক্স নং ৫৮, ঢাকা – ১০০০,

* মাসীহী জামাত, পোস্টবক্স নং ৩৫০৭, ঢাকা,

* আল হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট,

* ডাকযোগে বাইবেল শিক্ষার জন্য পোস্টবক্স ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

১৯৯৭ সালের তথ্য ও পরিসংখ্যানের সংরক্ষণ ও প্রচারে ব্যবহৃত হয় ৩১ কোটি ৫০ লক্ষ কম্পিউটার সেট। তাছাড়া ৩৪০০ রেডিও ও টেলিফোন সেন্টার খৃষ্টধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিল। দেশে বর্তমানে "ঈমানের পথ" নামে ইসলামী আঙ্গিকে রেডিও অনুষ্ঠান চালু করেছে।

২। বই প্রচার ও পত্রাদি বিলি

উল্লিখিত আন্তর্জাতিক খৃষ্টান মিশনারি গবেষণা বুলেটিন থেকে জানা যায়, খৃষ্টধর্ম বিষয়ক ১ লাখ ৯ হাজার ৯ শত ধরনের বই ও একত্রিশ হাজার তিনশত রকম ম্যাগাজিন প্রকাশ করা হয়। মুসলিম বিশ্বে বিনামূল্যে বিলিকৃত বাইবেলের সংখ্যা প্রায় ৬৩ কোটি ৯ লক্ষ ৪০ হাজার এবং মুসলমানদের জন্য ইসলামী পরিভাষায় রচিত বাইবেল অর্থাৎ "কিতাবুল মুকাদ্দাস" আঠারো কোটি তিরাশি লক্ষ তিরিশ হাজার। সর্বোপরি খৃষ্টবাদ, ইউরোপীয় ধর্মদর্শ ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের লক্ষ্যে ইসলামের বিরুদ্ধে ঘৃণ্যতম মিথ্যাচারে সমৃদ্ধ অগণিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রচারপত্র প্রকাশ করে চলেছে। ১৬ ই এপ্রিল ১৯৯৮ ইং সনে টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এডওয়ার্ডের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, ১৮৯০ সাল থেকে ১৯১৫ সালের মধ্যে অর্থাৎ ২৫ বছরে ইসলামের বিরুদ্ধে ষাট হাজার রকম বই প্রকাশ করা হয়েছে। এছাড়াও ভিডিও, অডিও ক্যাসেট প্রকাশ করা এবং "স্বর্গমত ম্যাগাজিন" উল্লেখযোগ্য।

৩। ধর্মগ্রন্থ ও সংস্থার নাম পরিবর্তন

মিশনারিরা মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য বিভিন্ন অপকৌশল অবলম্বন করে থাকে। যেমন খৃষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ সারা বিশ্বে বাইবেল নামেই বহুল পরিচিত। কিন্তু স্থান-কাল-পাত্রভেদে নাম পরিবর্তন করার কৌশলে খৃষ্টান মিশনারিদের জুড়ি নেই। সর্ব প্রথম বাংলা ভাষায় খৃষ্টানরা বাইবেলকে "ধর্ম পুস্তক" নামে ১৯৬৩ সালে "পাকিস্তান বাইবেল সোসাইটি" থেকে প্রকাশ করে। পরবর্তীতে স্বাধীন বাংলাদেশে একই সংস্থা "বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি" (বি. বি. এস.) তাদের গ্রন্থের নাম পরিবর্তন করে "পবিত্র বাইবেল" নামে প্রকাশ করে। উল্লেখ্য, উভয় নামের বাইবেলে (তথাঃ ধর্ম পুস্তক – ১. "বাংলাদেশ বাইবেল", ২. "পবিত্র বাইবেল"; মৌলিকভাবে দুটো অংশ রয়েছে – ১. "নতুন নিয়ম", ২. "পুরাতন নিয়ম") পরবর্তীতে সংস্থার নাম পাল্টিয়ে "মসীহী জামাত" নামকরণ করে তাদের পবিত্র বাইবেলকে "কিতাবুল মুকাদ্দাস" নামে প্রকাশ করে। এই কিতাবুল মুকাদ্দাসে "পুরাতন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "তৌরাত, জবুর ও নবীদের কিতাব" এবং "নতুন নিয়ম" অংশের নামকরণ করেছে "ইঞ্জিল শরীফ"। প্রমাণ্য ঐতিহাসিক সত্য হলো, ওসব নামের তৌরাত, জবুর ও ইঞ্জিল শরীফ আল্লাহ'র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ অবিকৃত কিতাব নয়।

৪। মুসলিম ঐতিহ্যবাহী নকশা নকল

খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের "কিতাবুল মুকাদ্দাস" ও "ইঞ্জিল শরীফ" এর মলাট সম্পূর্ণ ইসলামী ঐতিহ্যের ধারক প্রচ্ছদে অলংকৃত করে প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন রঙের সুদৃশ্য কভারের উপর সোনালী রঙের ইসলামী ধাঁচের প্রচ্ছদ দেখে এটাকে পবিত্র কুরআনের তাফসীর বা পবিত্র হাদিসগ্রন্থ বলে ভুল করা অস্বাভাবিক নয়।

তারা এখন তাদের যাবতীয় ধর্মীয় বই-পুস্তক, পত্র-পত্রিকা, পত্রাদির প্রচ্ছদ, মসজিদ, কালেমা, আরবি বর্ণের শৈল্পিক নকশা দ্বারা অলংকৃত করার অপকৌশল অবলম্বন করছে। এমনকি ইসলামের মৌলিক বিষয়াদি যেমন পর্দা, নামায, নারী শিক্ষা, ওযু ইত্যাদিকে বিকৃত উপস্থাপনে ও বক্তব্যে সমৃদ্ধ করে বই প্রকাশ করে চলেছে।

৫। ইসলামী পরিভাষা ও নামাবলী ব্যবহার

খৃষ্টান মিশনারিরা এতটুকুতেই ক্ষান্ত হয়নি। তারা তাদের ধর্ম গ্রন্থের নাম পরিবর্তনের সাথে সাথে ইসলামী পরিভাষা, শব্দ ও নামাবলী চুরি করে তাদের ধর্মগ্রন্থ ও বইগুলো প্রকাশ করে চলেছে। তাদের পবিত্র বাইবেলের কিছু শব্দ উল্লেখ করা হলো, যে শব্দগুলোকে তারা তাদের গ্রন্থ কিতাবুল মুকাদ্দাসে ইসলামী পরিভাষা ও নামের রূপ দিয়েছে (কিতাবুল মুকাদ্দাসের পরিবর্তিত রূপ ব্র্যাকেটে উল্লেখ করা হলো) –

আদিপুস্তক (আল-তৌরাত), প্রথম সিপারা (পয়দায়েশ), পরমগীত (নবীদের কিতাব সোলায়মান), গীতসংহিতা (আল জবুরঃ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম সিপারা), ঈশ্বর (আল্লাহ), ঈশ্বর পুত্র (ইবনুল্লাহ), পরিত্রাণ (নাজাত), ভাববাদী (নবী), ভজনা (এবাদত), বিশ্বাস (ঈমান), ব্যবস্থা (শরীয়ত), আব্রাহাম (ইব্রাহীম), মোশি (মুসা), দায়ুদ (দাউদ), যীশুখৃষ্ট (ঈসা মসীহ), দূত (ফেরেশতা), শির্ষ (সাহাবী), প্রায়শ্চিত্ত (কাফফারা), উবড় (সিজদা), যাচঞা (মুনাজাত), অলৌকিক কার্য (মোযেজা) ইত্যাদি।

৬। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম জালিয়াতি

সর্বোপরি তাদের নির্লজ্জ ও জঘন্যতম জালিয়াতির দৃষ্টান্ত হলো দীর্ঘ ১৬ বছর সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার পর কুরআনের বিভিন্ন আয়াত চুরি করে প্রতিটি অধ্যায়ে আরবিতে “বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম” দিয়ে শুরু করে তাদের কথিত ইঞ্জিল শরীফ প্রকাশ করেছে। অথচ তাদের কোন কিছু শুরু করা হয় “পিতা-পুত্র ও পবিত্র আত্মা” এর নামে। বিশ্বের ইতিহাসে ধর্মের নামে এতো বড় জালিয়াতির নজির আর নেই।

৭। পবিত্র কুরআনের অপব্যাখ্যা

ইদানিং তাদের ঘৃণ্য প্রতারণা ও ধোঁকাবাজী চরমে পৌঁছেছে। তারা কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের আংশিক প্রয়োগ এবং নিজেদের মনগড়া বানোয়াট অনুবাদ ও বাইবেলের স্বপক্ষে অপব্যাখ্যা দিয়ে নানা রকম পুস্তিকাদি প্রকাশ ও প্রচার করছে। যেমন ত্রিত্ববাদের মাঝে আল্লাহ এক, ইঞ্জিল ও কুরআনে ঈসা কালিমাতুল্লাহ’র ব্যক্তিসত্তা রক্তমাংসের দেহে আবৃত, আমরা কিভাবে সালাত কায়েম করি ?

তারা এখন তাদের বইয়ে সরাসরি কুরআনের আরবি আয়াত সংযোজন করছে। মুসলমানরা কুরআনের আয়াতকে সম্মান করে বলে তাদের ঘরে মিশনারিদের রচিত বই-পুস্তক স্থান পায়। কালার সমৃদ্ধ তাদের এ বইগুলো পড়ে সরল মনের সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হয় এবং ঈমান আমল হারিয়ে চিরস্থায়ী জাহান্নামের পথ ধরে। এভাবে মিশনারিগুলো তাদের (ঈমান ধংসের) লক্ষ্যে পৌছতে সক্ষম হয়।

তাদের প্রত্যেক বইয়ের শেষে প্রশ্নপর্ব থাকে। সেগুলোর উত্তর প্রদানে আরো বই ও উপহারের আশ্বাস দেওয়া হয়। বইয়ের বিকৃত বিষয়ের কোন প্রশ্ন করার সুযোগ নেই। তবুও কেউ প্রশ্ন করলে তারা নীরবতার কৌশল অবলম্বন করে। এভাবে যে কোন মূল্যে পাঠক থেকে মিথ্যার সাক্ষ্য নিয়ে কুফরীর পক্ষে স্বীকৃতি আদায় করে নেয়।

৮। নকল ইমাম তৈরি

তারা গোপনে খৃষ্টান দেশগুলোতে ছদ্মবেশী ইমাম তৈরি করে মুসলিম দেশে পাঠিয়ে দেয়। ইসলামের মৌলিক বিশ্বাসকে নষ্ট করে তাদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি করাই হলো এর মূল উদ্দেশ্য। এ বিষয়ে মধ্যপ্রাচ্যে পাদ্রীদের সম্মেলনে “জবাজ” নামক এক পাদ্রী বিশেষ সভায় সভাপতিত্বের ভাষণে বলেনঃ মুসলমানদের সাথে বিতর্কে আমরা বিজয়ী হতে পারবো না। তাই আমরা তাদের পরস্পরে ঝগড়া বিবাদ লাগিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করছি। এটা আমাদের সফলতার একমাত্র পথ। সুতরাং আমাদের সবাইকে দেশে বিদেশে এ ব্যাপারে কার্যকরী ব্যবস্থা নিতে হবে।

৯। ইসলামী নাম ধারণ

তারা এখন ইসলামী কায়দায় নাম রাখতে শুরু করেছে, যেমন – আবদুল ওয়াহহাব, সুলতান আহমেদ পৌল ইত্যাদি। তারা আরো একধাপ এগিয়ে নিজেদের খৃষ্টান পরিচয় না দিয়ে নিজেদের পরিচয় দেয় ঈসায়ী মুসলমান। তারা কালিমাও বানিয়েছে – লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ঈসা মসীহুল্লাহ।

১০। যুবতী প্রচারক

খৃষ্টান মিশনারির নারী সদস্যরা তাবলীগের ছদ্মবেশে মুসলিম নারীদের ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা চালাচ্ছে। তাদের প্রশিক্ষিত খৃষ্টান নারীরা (ধর্মান্তরিত করার) লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদের সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে, যাতে পরবর্তী জেনারেশনকে তাদের ধর্মে দীক্ষিত করতে পারে। কারণ স্বামী মুসলমান হলেও পরবর্তী জেনারেশনই তাদের টার্গেট। এমনকি মহিলা ফেরীওয়ালাদের মাধ্যমে তারা ধর্মপ্রচার করে থাকে।

১১। সমিতির মাধ্যমে প্রচার

খৃষ্টান মিশনারিগুলো প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামে-গঞ্জে পুরুষ-মহিলাদের নিয়ে সমিতি গড়ে তুলেছে। আর সেই সমিতির সদস্যদের পড়ানো হচ্ছে বাইবেল, বিভিন্ন সিডি প্রদর্শনীর মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে যীশুখৃষ্টের জীবনীমূলক চলচ্চিত্র। তাদেরকে পড়ানো হয় ইনজিল শরীফ, মানে বাইবেল। লুকের লেখা “হযরত ঈসা মসীহ” আর “মুসলমান ও হিন্দুরা ১০০ ভাগ জাহান্নামী আর খৃষ্টানরা ১০০ ভাগ জান্নাতি” সহ আরো কতো বিচিত্র বই। রাতের আঁধারে শিশু ও মহিলাদের দেখানো হয় বিভিন্ন সিডি।

“আগাবে” নামক একটি সমিতিতে সপ্তাহে ২ টাকা জমা নেওয়া হয় এ বলে যে, যখন এক হাজার টাকা জমা হবে, তখন তাদেরকে দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এ রকম লোভ দেখিয়ে তারা দরিদ্রদের হাত করছে। একজনকে ১৮ হাজার টাকার চাকরি দেওয়া হবে বলে খৃষ্টান

বানিয়েছে। ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চ ও খৃষ্টান লাইফ অফ বাংলাদেশ (সি.এল.বি.) ‘র ইউনিয়ন ইনচার্জ নতুন রায়ের ভাষ্যমতে, ১২ ই জুন ৪৫ জন মুসলমান ও ১৩ ই জুন ৫৬ জন হিন্দুকে শিশাতলী গির্জায় নিয়ে খৃষ্টান বানানো হয়েছে।

চ। সেবা দিয়ে তাদের টার্গেট কি ? [৪]

পৃথিবীর পথে-ঘাটে পড়ে থাকা শিশুদের আর রাস্তার ধারে অবহেলিত জারজ সন্তানদের তারা পিকাপে করে নিয়ে যায় তাদের সেন্টারে। এ শিশুদের মেধাবীদেরকে তারা শিক্ষা-দীক্ষা দিয়ে ডাক্তার, পাইলট, সেনাবাহিনী ইত্যাদি বানায়। পৃথিবীর কোথাও যুদ্ধ বাঁধলে এদেরকে ব্যবহার করে। যেমন বর্তমানে আফগান, ইরাকে যুদ্ধরত বহু আমেরিকান ও ব্রিটিশ সৈন্য মারা পড়ছে কিন্তু এদের অনেকের জন্য চোখের পানি ফেলার মতো কোন আপনজন পাওয়া যায় না, কারণ এদের অধিকাংশই পথের ধারের অবহেলিত পরিচয়হীন জারজ সন্তান।

১। মি. বুশের একটি ভাষণ [৪]

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ ইরাক আক্রমণের পূর্বে এক ভাষণ দেন যা ১৪ টি ভাষায় প্রচারিত হয়েছিলো। তিনি বলেছিলেন – ঈশ্বর মার্কিন সরকারকে নির্দেশ দিয়েছেন ভালোকে সম্প্রসারণ এবং মন্দকে প্রতিহত করতে। তাই এই সরকার বাইবেলে প্রদত্ত নীতি অনুযায়ী মার্কিন জাতিকে রক্ষা এবং সারা বিশ্ববাসীকে গোলামীর হাত থেকে বাঁচাবার জন্য যুদ্ধে সৈন্য পাঠাচ্ছে। তিনি বলেন – মানুষকে মুক্ত করার জন্য আসলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করতে হবে। মার্কিনীদের ছত্রছায়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচার খুব দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। যাদের বাপ নেই, মা নেই, আর যারা বিধবা, স্বামী নেই, তাদেরকে খৃষ্টান বানানোর জন্য পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে।

২। মিশনারি স্কুলের মাধ্যমে তাদের টার্গেট [৪]

খৃষ্টান মিশনারি প্রেরক সমিতির সভাপতি বলেন, খৃষ্টান মিশনারিদের বড় উদ্দেশ্য, যে সব ছাত্র আমাদের স্কুল কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপন করে বের হচ্ছে, তাদের মন মস্তিষ্ক আমাদের ধাঁচে গড়ে তোলা। (আপনি ঢাকায় বা বাংলাদেশের প্রায় অঞ্চলে দেখবেন একটি স্কুলে ছাত্র দেওয়ার চেয়ে অভিভাবকরা বেশী খুশী হোন মিশন বা গির্জা স্কুলে ছেলে মেয়েদের ভর্তি করতে পেরে। কারণ ইংলিশ মিডিয়ামে পড়বে, ইংরেজি বলতে পারবে, স্মার্ট হবে, বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তির সুযোগ পাবে, বহির্বিশ্বে উচ্চ শিক্ষার জন্য যেতে পারবে।) তিনি বলেছেন, কোন গির্জা স্কুলে যদি কোন মুসলমান ছেলে পড়ে তাহলে আমাদের লাভ। কারণ নিশ্চিতভাবে বলা যায়, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে গেছে। জুমআয় যাবে, ঈদের নামায পড়বে, মা-বাবা মারা গেলে জানাযায় যাবে কিন্তু মন-মেজাজ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা ইসলাম বিমুখ হবে। ইসলামের পক্ষে সে কথা বলবে না। বরং সে নিজের অজ্ঞাতে আমাদের মিশনারিগুলোর একজন বড় পৃষ্ঠপোষক হয়ে যাবে। বর্তমানে তাদের কথার প্রতিফলনের বহু নমুনা দেখা যাচ্ছে।

আপনি দেখবেন, পৃথিবীর যেখানে খৃষ্টান মিশনারিগুলোর স্কুল আছে, সেখানে গির্জাও আছে। গির্জা ছাড়া পৃথিবীতে কোথাও তাদের স্কুল কলেজ গড়ে উঠেনি, এমনকি লন্ডন ইউনিভার্সিটিও না। তার পাশে রয়েছে ভেস্টওয়ান খ্রিস্টিয়ান চার্চ। কিন্তু আমরা মুসলমানরা যদি যদি কোন স্কুল-কলেজ ইউনিভার্সিটির পাশে মসজিদ বানাতে চাই, তখন আমাদেরকে মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক আখ্যায়িত করা হয়। আপনি নটরডেমে যান কিংবা মোহাম্মদপুরে আসাদগেট মিশনারি স্কুলে, সাথেই গির্জা দেখতে পাবেন। তিনি আরো বলেছেন, আমাদের স্কুলে যদি তাকে মেট্রিক বা ইন্টারমিডিয়েট পড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলে সে আমাদের মিশনারির বিপক্ষে একটি টু শব্দও করবে না।

দৈনিক নয়া দিগন্তের এক রিপোর্ট অনুযায়ী নীলফামারীতে আরো পাঁচটি সংগঠন রয়েছে, যারা ধর্মান্তরের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা তাদের প্রতিষ্ঠিত স্কুলগুলোতে বাধ্যতামূলকভাবে যীশু খৃষ্টের বই, যীশু খৃষ্টের জীবনী ইত্যাদি পড়ায়। ছোটদেরকে “সিবগাতুল্লাহ” নামের একটি বই পড়ানো হয় যাতে বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ের পাঠদান করে কচি বাচ্চাদের মগজ ধোলাই করা হয়। সেভেন ডে এডভেঞ্চারিস্টের একটি স্কুলে ছোট ছোট ছেলেদের বাধ্যতামূলকভাবে “ইটালি ডে জারি”র লেখা “আমার বাইবেলের বন্ধুগণ” পড়ানো হচ্ছে। জার্মানভিত্তিক ন্যাজরিয়ান মিশন সংগঠনটি বিনামূল্যে বই, খাতা, পোশাক এমনকি দুপুরের খাবারসহ বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে ধর্মান্তরিতকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

৩। মিশনারি স্কুলের এক শিক্ষার্থীর অভিভাবকের উক্তি

হালুয়াঘাটে সফরকালে এক ভাইয়ের সাথে কথা হচ্ছিলো। তিনি বলেন, আমার ছেলে মিশনারি স্কুলে বাইবেলও পড়ে। কথাটা খুব গর্বের সাথে বলছিলেন।

ছ। পরিসংখ্যান [৪-৬]

দারিদ্র্য বিমোচন ও উন্নয়ন মূল দাবী হলেও তাদের কোন কোন এনজিও এসব কর্মকাণ্ডের আড়ালে খৃষ্টান মিশনারির "ধর্মান্তর কর্মসূচি" প্রাধান্য দিয়ে থাকে। তারা সমাজের অনগ্রসর ও পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে ধর্মান্তরের প্রধান টার্গেট বানায়। খৃষ্টান মিশনারি ও তাদের সহযোগী এনজিওগুলো কাজের ও কর্মসূচীর দিক দিয়ে ভিন্ন হলেও তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অভিন্ন। উভয়ের প্রধান লক্ষ্য বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যার বিস্ফোরণ ঘটানো। এ লক্ষ্য সামনে রেখে আমাদের দেশে এনজিও ও মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তারা অনেকটা সফল। বাংলাদেশের খৃষ্টান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার লক্ষ্য করলে সে কথার প্রমাণ মিলে।

১৮৮১ সালে প্রতি ৬ হাজার লোকের মাঝে ১ জন খৃষ্টান ছিল। সে সংখ্যা জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতি ৩২৬ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৮১ সালে প্রতি ২৯ জনের মাঝে ১ জন, ১৯৯১ সালে প্রতি বাইশজনের মাঝে একজন খৃষ্টান রয়েছে বলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। ১৯৩৯ সালে খৃষ্টান জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজার। তা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯১ সালে আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩.৫ লাখ। ২০০১ সালের আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা ৩.৮ লাখ। ২০২১ সালের আদমশুমারিতে খৃষ্টান জনসংখ্যা ৫ লাখ। বাস্তবে এ সংখ্যা ২ কোটি ছাড়িয়ে গেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে কেননা খ্রিস্টান মিশনারি থেকে ধর্মান্তরিত নতুন খ্রিস্টানদের তাদের পূর্বের ধর্ম ও নাম পরিবর্তন করতে নিষেধ করা হয়েছে। এটা খ্রিস্টান মিশনারির নতুন কূট কৌশল।

ঢাকায় খৃষ্টানদের সবচেয়ে বড় গির্জা "হলি রোজারি"। ১৮৭৭ সালে পর্তুগিজ ব্যবসায়ীগণ এটি নির্মাণ করেন। ১৯৫২ সালে উক্ত গির্জায় উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ১৫৩ জন আর ১৯৭৬ সালে তা ৩০০০ জনে উন্নীত হয়, ১৯৮৩ সালে উপস্থিতি ৬০০০ জনে আর ১৯৯৮ সালে উপস্থিতির সংখ্যা ৫০,০০০ এ পৌঁছে।

বাংলাদেশে এনজিও ব্যুরোর তথ্য অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যপুষ্ট এনজিও সংখ্যা ৮৫০। এর বাইরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিবন্ধন নিয়ে কাজ করছে এমন এনজিওর সংখ্যা বিশ থেকে ত্রিশ হাজার অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি ১.১৮ বর্গমাইলের মাঝে একটি এনজিও কাজ করছে।

বাংলাদেশে এনজিও কার্যক্রমের বিস্তার সম্পর্কিত ব্যাপারগুলোর পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এ পর্যন্ত এনজিও আওতাধীন গ্রামের সংখ্যা ৪০ হাজার, পরিবারের সংখ্যা ৩৫ লাখ। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে এনজিওদের বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ১ হাজার কোটি টাকা। উপ-আনুষ্ঠানিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৩০ হাজার। ছাত্র ছাত্রীদের সংখ্যা ১০ লাখ, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র ৪৪ লাখ, এনজিওদের রোপণকৃত বৃক্ষের সংখ্যা ৪ কোটি। উপরোক্ত তথ্য ও সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হয়, তখন খৃষ্টানদের সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ। কিন্তু ২০১০ সালে মদিনা ইউনিভার্সিটি একটি পরিসংখানে দেখায়, বাংলাদেশে বর্তমান খৃষ্টানদের সংখ্যা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ ১ কোটি। আর বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৫ কোটির উর্ধ্বে। মুসলমানদের সংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। আর খৃষ্টানদের সংখ্যা প্রায় ১৩ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন প্রশ্ন জাগে, তারা কি একজন ১৩ জন করে সন্তান জন্ম দিয়েছে ? আবার, জন্মনিয়ন্ত্রণ থিওরি তাদেরই মতবাদ। যদি বলা হয়, না; তাহলে এই বাকি জনসংখ্যা এলো কোত্থেকে ? অবশ্যই এরা ধর্মান্তরিত খৃষ্টান।

পাহাড়িদের বিভিন্ন উপজাতি

এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম, ত্রিপুরা, খাশিয়া, মনিপুরী, খিয়াং, মাংখু, লুশাই, মগ, গারো, মুরু, সাঁওতাল, রাখাইন, হাজং, রাজবংশী, মুরং, কুকি, হুদি, পাংখো, উড়াও, বোনজোগী, দালই, লুসাই, খুশী, তংচংগা, বংশাই, বোম, মুনী চাক, চোক, হরিজন, মুন্ডা ইত্যাদি – এগুলো আলাদা আলাদা জাতিগোষ্ঠী। এক গোত্র আরেক গোত্রের সাথে বিয়ে-বন্ধনে আবদ্ধ হয় না। বৈবাহিক ক্ষেত্রে তারা বংশীয় সীমাবদ্ধতার মধ্যে আবদ্ধ। এসব সম্প্রদায়ের মধ্যে শুধু "পাঙন" সম্প্রদায় ছাড়া অন্য উপজাতির অধিকাংশ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আবার ১০.৫ % হিন্দু জনসংখ্যার বিপুল পরিমাণ লোক ধর্মান্তরিত হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে।

জ। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করনের অপতৎপরতাঃ [৪]

১। উত্তরবঙ্গঃ

ক। সাঁওতালদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা

সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোক বেশীরভাগ বসবাস করে রাজশাহী, দিনাজপুর, রংপুর তথা উত্তরাঞ্চলে।

পীরগঞ্জ থানার একটি পল্লীর কথা আলোচনা করবো, এই তথ্যটি "ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া" ৭১ নং পৃষ্ঠা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। এটা সাঁওতাল উপজাতির একটি দরিদ্র পল্লী। এ অঞ্চলে এ ধরনের বেশ কয়েকটি উপজাতি পল্লী আছে। যেমন – চৈত্রকল (মাহেলিপাড়া), খালিসা (মিশনপাড়া), বসুদেবপুর (ডুমারপাড়া), অনন্তরামপুর, দুর্গাপুর, উধলাপাড়া, পৈত্রীপাড়া, কাদিরাবাদ, মুনাইল ইত্যাদি।

এরা সবাই উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সাঁওতাল, বুনো, উড়াও ও পৈত্রী ইত্যাদি নামে বিভক্ত। এদের পেশারও ভিন্নতা রয়েছে। কেউ বাঁশ-বেতের কাজ করে, কেউ করে কৃষি কাজ। এদের কারো স্থায়ী আয়ের কোন উৎস নেই। মুসলমান পাড়ায় গতর খেটে এবং বাঁশ-বেতের জিনিসপত্র বিক্রি করে তারা জীবিকা নির্বাহ করে। এরা অত্যন্ত নিরীহ ও শান্ত প্রকৃতির। আলোচিত পল্লী রংপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার "চৈত্রকল ইউনিয়নে" অবস্থিত। এ ইউনিয়নের উপজাতির সংখ্যা প্রায় ত্রিশ হাজার। তারা সবাই নিজেদেরকে আদিবাসী হিসেবে পরিচয় দিতে গর্ববোধ করে।

ক্ষুধা এদের নিত্যদিনের সাথী, দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত জীবন, দারিদ্রের নির্মম ক্ষতচিহ্ন এদের চেহারায়। বঞ্চনাকে ওরা ভাগ্যের নির্মম পরিহাস হিসেবে মেনে নিয়েছে। দুঃখ ও যন্ত্রণাকে ওরা ভাগ্যলিপি হিসেবে ধরে নিয়েছে। তাই এর জন্য ওদের কারো প্রতি ক্ষোভ ও খেদ নেই। আছে শুধু জীবনের অচল চাকা একভাবে চালিয়ে নেওয়ার নিরন্তর প্রয়াস। জীবনের গ্লানি ও যন্ত্রণা ভুলে থাকার জন্য হয়তো তারা মদ ও নেশা প্রাত্যহিক জীবনের অঙ্গ হিসেবে বেছে নিয়েছে। সভ্যতার আলো আজও ঐ দরিদ্র পল্লীতে প্রবেশ করেনি। তারা এখনো আদিম প্রথায় জীবন চালায়। শিক্ষা, চিকিৎসা এ অন্ধকার পল্লী থেকে নির্বাসিত।

তাদের ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানও অত্যন্ত সীমিত। বছরে একবার তারা ডালপূজা করে। অর্থাৎ গাছের একটি ডাল আসরের মধ্যভাগে পুঁতে তাকে ঘিরে সারারাত নারী-পুরুষ কীর্তনের মাধ্যমে অতিবাহিত করে। কৃষি মওসুমে যখন কাজ থাকে, তখন তারা মুসলমান পাড়ায় গিয়ে বিত্তবান ও স্বচ্ছল লোকদের বাড়িতে মজুরী খাটে। যখন কাজ থাকে না, আকালের সময় বনে জঙ্গলে বিভিন্ন গাছের পাতা ও বনজ আলু কুড়িয়ে আনে। হলুদ মরিচ মসলা ছাড়া শুধু লবণ দিয়ে সিদ্ধ করে আলু দিয়ে তারা ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে। শীতের সময় এসব মানব সন্তানরা শীত নিবারণের জন্য আদিম প্রথায় উঁচু করে মাচা বাঁধে আর নিচে আগুন জ্বালিয়ে বসে রাত কাটায়। রংপুর, পীরগঞ্জ অঞ্চলে ছয় মাস পর্যন্ত আকাল থাকে। তখন তাদের কাজ থাকে না। আবার যারা বাঁশ-বেতের কাজ করে, তারাও তাদের পণ্য বিক্রি করতে পারে না। তখন জীবন একেবারে অচল হয়ে পড়ে। মুসলমান পাড়ায় গিয়ে চেয়ে-চিন্তে ধার-কর্জ করে চলতেও তারা অভ্যস্ত নয়। অভাবের সময় এসব দরিদ্র পল্লীতে সরকারী-বেসরকারী পর্যায় ঋণদানেরও কোন প্রথা চালু নেই।

সবচেয়ে ভয়াবহ চিত্র রংপুর জেলার চৈত্রকল ইউনিয়নের। সেখানকার ছাব্বিশটি পরিবার প্রায় সবাই ইতিমধ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। চৈত্রকলস্থ "খলিশা মিশন" এ বিষয়ে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে চলেছে। পল্লীর নিভৃতকোণে নীরব বিপ্লব সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। বিশাল জমির উপর প্রতিষ্ঠিত খালিশা মিশনে স্থায়ীভাবে বহুলোক কর্মরত আছেন। এ মিশনে আছে চিকিৎসা সেবা ও দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়ার সুযোগ।

মাহেলী পাড়ার জনসংখ্যা প্রায় দুইশত। ওখানে সদ্য নির্মিত হয়েছে মনোরম একটি গির্জা। এর তত্ত্বাবধান করেন লুইস দুখু। তাকে প্রশ্ন করা হলো, উপজাতি সম্প্রদায় এদেশের হাজার হাজার বছরের সংস্কৃতির অঙ্গ। এ ঐতিহ্য-চ্যুতির কারণ কি ? উত্তরে তিনি জানান, আমরা অবহেলিত সম্প্রদায়। আমাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার কেউ নেই। খৃষ্টানরা আমাদের কাছে আসে, তারা আমাদের সুখ-দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে। তাদের আদর-যত্ন আমাদের আকৃষ্ট করছে। খৃষ্টানরা কোন বৈষয়িক বিষয়ে সাহায্য প্রদান করে কিনা, এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, কই, তারাও তো কোন সাহায্য করছে না।

উধলাপাড়ার অশীতিপর বৃদ্ধা নৌরি, স্বামী রামধন। তার কাছে জানতে চাওয়া হলো, জীবন কেমন চলছে ? উত্তরে তিনি বললেন, কষ্ট করে চলি। সেখানকার উপজাতিদের দারিদ্র্য বিমোচনের কোন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। এ দরিদ্র পল্লী আগে যে তিমিরে ছিল আজও সেই তিমিরেই আছে। হওয়ার মাঝে হয়েছে শুধু উপজাতির ধর্মীয় পরিচয় বিলুপ্তি। সুচতুর খৃষ্টানরা হয়তো জানে, কোন জাতি ও সম্প্রদায়কে ছলে-বলে, কৌশলে একবার ধর্মান্তরিত করতে পারলে তাদের প্রতারিত ও প্রবঞ্চিত হওয়ার অভিযোগ সাময়িক। তারপর প্রজন্মের পর প্রজন্ম জানবে – তারা খৃষ্টানের ঘরে খৃষ্টান।

এ তো হলো একটি ইউনিয়নের প্রতিবেদন, এ ছাড়া কতো ইউনিয়ন গ্রাম রয়েছে, সেখানে যারা এদের মতো বা এদের চেয়ে বেশী আমাদের কাছে সর্বদা অস্পৃশ্য সম্প্রদায় হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে। আমরা তাদের খোঁজ-খবর নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করি না, যা ছিল আমাদের

কর্তব্য, দায়িত্ব ও ঈমানি ফরিযা। পাশে না দাঁড়ানোর ফলে সাত সমুদ্র তের নদী পাড়ি দিয়ে খৃষ্টান মিশনারিরা তাদের পাশে গিয়ে খোঁজ-খবর নিয়ে ধর্মান্তরিত করছে। উচিৎ তো ছিল আমরা তাদের খোঁজ খবর নিবো।

উপজাতি সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। তারা আমাদের সেবা দিয়ে যাচ্ছে। নিবেদিত প্রাণ এসব হতদরিদ্র আদম সন্তানদের খোঁজ নেওয়া আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। কিন্তু আমরা কি এ দায়িত্ব পালন করছি ? অথচ প্রতিবেশীর সেবা ও খোঁজ নেওয়ার ক্ষেত্রে আমাদের গৌরবের সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

ইসলাম আমাদেরকে প্রতিবেশীর কর্তব্য পালনের জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ দিয়েছে। এ ব্যাপারে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদিস বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন – “যে ব্যক্তি পেটপুরে খায়, অথচ তার প্রতিবেশী অনাহারে রাত পোহায়, সে আমার উম্মত নয়।” অন্যত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন – “আল্লাহ’র শপথ, সে ব্যক্তি মুমিন নয়।” এভাবে তিনবার বললেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), এ কোন ব্যক্তি।” রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “যার ক্ষতি থেকে তার প্রতিবেশীর সম্পদ ও ইজ্জত নিরাপদ নয়।” এ থেকে প্রতিবেশীর অধিকারের গুরুত্ব সহজেই অনুমেয়। এতে হিন্দু মুসলমান খৃষ্টানের কোন পার্থক্য নেই। প্রতিবেশী যে পরিচয়েই হোক, তার প্রতি বিশেষ কর্তব্য পালনকে ইসলাম বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। এ মহান কর্তব্যটুকু আমাদের পূর্ববর্তীদের দ্বারা যথাযথভাবে পালিত হয়েছিলো বিধায় দলে দলে লোক ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

বড় আফসোস! আমরা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের হতভাগা অংশ (নোটঃ লেখক “হতভাগ্য উম্মত” লিখেছিলেন, আমি সেটা চেইঞ্জ করে দিয়েছি)। আরা রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নীতি বিচ্যুত হয়েছি। সেজন্য এতো দুর্গতি ও লাঞ্ছনা। এখানে একটি কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় – আজ আমরা যাদের অবহেলা ও তাচ্ছিল্য ভরে দূরে সরিয়ে রাখছি, যাদের প্রতি আমাদের ন্যূনতম কর্তব্যবোধ আছে বলে মনে করছি না। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয়, যেদিন এসব অবহেলিত সম্প্রদায় একটি বৃহৎ জাতিতে রূপ নিবে। তারা প্রশিক্ষিত হবে, আর অতীত বঞ্চনা ও প্রবঞ্চনার জন্য আমাদের দায়ী করবে। স্থায়ীভাবে আমাদের মাথা ব্যাথার কারণ হবে। তার উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত লেবানন। সেখানে খৃষ্টানরা স্থায়ীভাবে গৃহযুদ্ধ লাগিয়ে একটি সমৃদ্ধ মুসলিম দেশকে তিলে তিলে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

ইসলাম হলো আমাদের কাছে আমানত। আমরা কি এই আমানত তাদের কাছে পৌঁছিয়েছি ? ইসলামের দাওয়াত পাওয়া তাদের অধিকার। আমরা কি তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন করিনি ? এখনো সময় আছে তাদের পাশে দাঁড়াবার। এখনো সময় আছে তাদের আমানত পৌঁছানোর। আসুন, আজ থেকে আমরা তাদের হক পৌঁছে দেওয়ার প্রতিজ্ঞা করি। জাহান্নামের পথ থেকে বাঁচিয়ে জান্নাতের পথ দেখিয়ে দেই। যা ছিল আমার আপনার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় সুন্নাত।

খ। দিনাজপুর ও পঞ্চগড়ে মুসলমানদের খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা

লোমান তপন, পিতা মরটিন তপন। চকবানারসি গ্রামের বাসিন্দা। তিনি উপজাতি খৃষ্টান, অর্থাৎ তিনি পূর্বে উপজাতি ছিলেন, বর্তমানে তিনি খৃষ্টধর্মাবলম্বী। তিনি জানান, চকবানারসি অঞ্চলে “নিচপাড়া মিশন” এর প্রচেষ্টায় প্রায় ৫ শত পরিবার খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। নিচপাড়া মিশনটি এ প্রত্যন্ত অঞ্চলে সেবার আড়ালে ধর্মান্তরিতকরণের কাজে ব্যাপক সফলতা অর্জন করেছে। এটি ইটালিয়ান মিশন। এখানে দুজন ফাদার ও চারজন সিস্টার সার্বক্ষণিকভাবে মিশনের দায়িত্ব পালন করছেন। এ মিশনটি বীরগঞ্জ থানার উত্তরে, প্রায় তিন মেইল ভিতরে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত। বিশাল জায়গা নিয়ে এর অফিস ভবন, গির্জা ও মিশনারি স্কুল স্থাপিত হয়েছে।

এছাড়াও মিশনের বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে চাকরিদানের লোভনীয় টোপ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্থানীয় লোকজনের অভিযোগ, খৃষ্টান মিশনারিগুলোতে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলে চাকরি মিলে না। চাকরির প্রলোভনে পড়ে অনেক মুসলমান বিভ্রান্ত হচ্ছে। তারা প্রকাশ্যে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ না করলেও ভিতরে ভিতরে পুরোদস্তুর খৃষ্টধর্মনিষ্ঠ। মুসলমান ছেলে-সন্তানদের খৃষ্টধর্মে আকৃষ্ট করার জন্য মিশনারিগুলোতে প্রায়শই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে আকর্ষণীয় কর্মসূচী পালন করা হয়। এসব কর্মসূচীতে আকৃষ্ট হয়ে আশেপাশের মুসলমান সন্তানরা নিয়মিত মিশনে যাতায়াত করছে। ফলশ্রুতিতে নতুন প্রজন্মে খৃষ্টানিজম মানসিকতা গড়ে উঠছে। (বীরগঞ্জ উপজেলা সদর থেকে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে লুথারেন মিশনের প্রতিবেশী)। এ তো ছিল থানার প্রতিবেদন, তারপরেও এটি হলো আজ থেকে প্রায় ৭/৮ বছর পূর্বে। এখন একটু অনুমান করুন, এই সাত / আট বছরে পরিস্থিতি কীরূপ হতে পারে। এই অধমের জন্মও সেই বীরগঞ্জ থানায়, তাই প্রায়ই তাদের সামনাসামনি হতে হয়। এক সময় দেখতাম, আমাদের (_?_) এলাকার সাঁওতালরা ধানক্ষেত ও জঙ্গল থেকে ইঁদুর ও শিয়াল ধরে খেতো আর সাধারণভাবে চলাফেরা করতো। আমরা যেহেতু তাদের কাছে যাইনি, তাদের পাশে দাড়াইনি, ফলে ভিন দেশ থেকে লাল চামড়ার

লোকেরা তাদেরকে শিক্ষিত বানিয়েছে। একদিন এক সাঁওতাল ভাইয়ের সাথে কথাবার্তা হচ্ছিলো, সে গর্বের সাথে বলছিলো – আমাদের অমুক ডাক্তার খৃষ্টান, আমাদের অমুক অফিসার খৃষ্টান।

এই তো এই বছরের শুরুর দিকে একদিন বীরগঞ্জ উপজেলার শহর থেকে ভ্যানে করে বাড়িতে ফিরছিলাম। মেইন রাস্তার পাশে সারিবদ্ধ ছোট ছোট মাটির ঘরের এক বিস্তীর্ণ মহল্লা। মহল্লাটি সাঁওতালদের। হঠাৎ দেখি রাস্তার পাশে মহল্লার মাঝে নতুন একটি ঘর, সেখানে কিছু ছেলে মেয়ে সারিবদ্ধভাবে হাঁটুতে ঠেক দিয়ে কি যেন বলছে, আমার কৌতূহল সৃষ্টি হলো। কারণ ইতিপূর্বে এমনটি কখনো দেখিনি, যদিও আমার যাতায়াত সাধারণত এ পথেই হয়ে থাকে। ভ্যানগাড়ি থামিয়ে সেখানে গেলাম আর একজনকে জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি হচ্ছে। লোকটি উত্তরে বললো – উপাসনা হচ্ছে। আবার প্রশ্ন করলাম – কিসের উপাসনা। সে বললো – ক্যাথলিকদের উপাসনা। ক্যাথলিক ! ক্যাথলিক তো খৃষ্টান। সে বললো – আমরাও তো খৃষ্টান। আমি বললাম – আপনারা তো খৃষ্টান ছিলেন না, আপনারা তো সাঁওতাল। কতদিন আগে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন ? জবাবে বললো – এই তো কয়েকদিন হলো। কেন খৃষ্টান হলেন ? বললো – তারা আমাদের ঋণ প্রদান করে, আমাদের কাছে আসে। আমি সেই লোকটিকে বুঝালাম আর ইসলাম ধর্মের দাওয়াত দিলাম। সে উত্তরে বললো – আপনি তো আগে আসেননি, আগে বললে আমি ইসলামধর্ম গ্রহণ করতাম, এখন সম্ভব না। কারণ আমাদের গোষ্ঠীর সকলেই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছেন। আমি মুসলমান হলে সবকিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে। এ তো ছিল সাঁওতাল বস্তির কথা। এমন আরো যে কতো মুসলিম পরিবারকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে, তা কি আমরা খবর রাখি ?

আমার বন্ধু মাওলানা আব্দুর রহমান সাহেব আমাকে বলছিলেন, আপনার পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ কারিতাসের দাওয়াতে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে তা কি খবর রাখেন ? তিনি আরো বললেন – আমি নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানতে পেরেছি যে, এদের কয়েকজন খৃষ্টান নিজেদের পরিচয় গোপন রাখে, খৃষ্টান বলে প্রকাশ করে না।

আপনিও আপনার আশেপাশে খোঁজ করলে এমন অনেক মানুষ পাবেন, যারা মিশনারিদের ধোঁকায় বিভ্রান্ত। এদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব। এ কর্তব্য পালনের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমাদের ব্রতী হওয়া আবশ্যক। নতুবা পরিণতি কি দাঁড়ায় তা বলা কঠিন।

আরও একটি ঘটনা। রমযানুল মুবারাকের শেষ দিনগুলোতে ঈদুল ফিতরকে কেন্দ্র করে বাড়ি যাওয়ার ধুম পড়ে। আমি দুজন নওমুসলিমকে নিয়ে আমার বাড়ি দিনাজপুরের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা কমলাপুর স্টেশনে যাচ্ছিলাম, এমন সময় মোবাইল ফোন বেজে উঠলো। রিসিভ করে সালাম বিনিময়ের পর বুঝতে পারলাম, ফোন করেছেন মাওলানা রায়হান সাহেব (সম্ভবত তিনি জামিয়া নূরিয়া কামরাঙ্গীর চর মাদরাসার দারুল ইকামা হোস্টেল পরিচালক)। তিনি বললেন – যুবায়ের ভাই, কয়েকদিন ধরে ফোন করছি, আপনাকে পাচ্ছি না। মাওলানা ওমর আলী সাহেবকেও পাচ্ছি না। আমি বললাম, হুজুর তো উমরার সফরে গিয়েছেন। এবার বলুন, কি খেদমত করতে পারি ? তিনি বললেন – আমাদের মাদ্রাসার এবতেদায়ী শ্রেণীর এক ছাত্র নাজিবুর রহমান জানালো, তাদের এলাকায় খৃষ্টানরা চ্যালেঞ্জ করেছে যে, আমরা তোমাদের কিছু প্রশ্ন করবো, যদি উত্তর দিতে পারো তাহলে আমরা মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর দিতে ব্যর্থ হও, তাহলে তোমাদেরকে খৃষ্টান হতে হবে। এলাকাবাসী উত্তর খোঁজার লক্ষ্যে এই এবতেদায়ী ছাত্রের কাছে এসেছে। কারণ সে-ই ঐ এলাকার বড় হুজুর। এখন ছেলেটি এ বিষয়ে আমাদেরকে জানিয়েছে। যেহেতু দীর্ঘদিন আপনারা খৃষ্টান মিশনারির তথ্য অনুসন্ধান ও তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধের সাথে জড়িত, তাই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন কি ?আমি বললাম, অবশ্যই। ইন শা আল্লাহ।

আমি ঐ ছেলের নাম, মোবাইল নাম্বার ও পূর্ণ ঠিকানা সংগ্রহ করলাম। জানতে পারলাম, স্থানটি হলো দিনাজপুরের ফুলবাড়ী থানা। বিষয়টি নিয়ে ভাবতেই আমার খুব কান্না পেলো, সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশে বাস করে সত্য ধর্ম ইসলামের অনুসারী হয়ে মিথ্যার উপর ভর করা ভিত্তিহীন, বিকৃত ধর্মানুসারীর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয় ! এর জন্য আমরাই দায়ী। দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এমন পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

যাই হোক, ২৮ রমযানে বাড়ি ফিরলাম, চিন্তা – ঈদের আগের দিনই যাবো। ফোনে যোগাযোগ করে ঈদের পর তৃতীয় দিন বিতর্কের তারিখ ঠিক হলো। তৃতীয় দিন সকাল সকাল আমি বীরগঞ্জ থেকে রওনা হলাম, বন্ধু সারওয়ার ও ইমরান ভাইসহ সেই অজপাড়া গাঁয়ে পৌঁছলাম।

সেই এলাকায় খৃষ্টান মিশনারি “ওয়ার্ল্ড ভিশন সংস্থা” এলাকার মহিলাদের গরু, ছাগল ঋণ দেয় এবং প্রতি মাসে পশুপাখি কিভাবে লালন-পালন করবে তারও প্রশিক্ষণ দেয়। প্রশিক্ষণেরই এক পর্যায়ে কুরআনের উপর প্রশ্ন উত্থাপন করে, ধর্মান্তরিত করার লক্ষ্য বাস্তবায়নের তৎপরতায় লিপ্ত হয় এবং গ্রাম্য সরলমনা মহিলাদের এ বলে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে যে, যদি তোমরা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারো, তাহলে

অফিসের আমরা সকলেই মুসলমান হয়ে যাবো। আর যদি উত্তর না দিতে পারো তাহলে তোমরা সকলেই খৃষ্টান হয়ে যাও। সেই মহিলারা মাদ্রাসার ছাত্র নাজিবুর রহমানকে প্রশ্নগুলো জানালো।

আমাদের আগমনে এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হলো। ঢাকা থেকে উলামায়ে কেরামের আগমন টের পেয়ে ওয়ার্ল্ড ভিশনের লোকেরা হতচকিত হয়ে পড়লো। বহু চেষ্টা করেও তাদের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি। মোবাইলও ছিল বন্ধ।

এ হলো মিশনারিগুলোর অবস্থা। মুখে মুখে সেবার মোহনীয় শ্লোগান। এর আড়ালে জনগণের সরলতার সুযোগে ধর্মান্তরের চেষ্টা। এ ব্যাপারে এখনই সতর্ক করা আমাদের কর্তব্য।

গ। লালমনিরহাটের মসজিদের খতীব খৃষ্টান

২০০৯ সালে এক সফরে লালমনিরহাটের আদিতমারি থানায় যাই। সেখানে যাওয়ার পর এলাকার মানুষ জানালো যে, আমাদের এলাকায় একজন খতীব সাহেব আছেন যিনি মসজিদে জুমআর খুতবায় এমন কিছু কথা বলেন, যা আপত্তিকর। তিনি বলেন, নামায পড়তে পড়তে যদি কারো কপালে দাগ পড়ে যায় তবুও সে জাহান্নামে যাবে। খতীব সাহবে আরো বলেন, কেয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালামের পুনরাগমন ঘটবে। তখন তো তাকে মানতে হবেই। তাহলে এখন মানতে অসুবিধা কোথায় ? আরো বলেন – মাটির নিচের নবী উত্তম না আসমানের উপরের নবী উত্তম ? যিন্দা নবী উত্তম না মৃত নবী উত্তম ইত্যাদি। আমরা যখন খতীব সাহেবের ব্যাপারে অনুসন্ধান করলাম, জানা গেলো তিনি আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সক্রিয় সদস্য। আর আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্ট হলো খৃষ্টান মিশনারির ছদ্মবেশী একটি সংস্থা। সেবার আবরণের খৃষ্টধর্ম প্রচারই যাদের মূল লক্ষ্য। সেখানে সেকান্দার মাস্টার নামে আল-হানিফ কল্যাণ ট্রাস্টের একজন সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ হলো, যিনি একটি মসজিদের সভাপতি। তিনি আমাদেরকে কুরআনের উপর উত্থাপিত খৃষ্টানদের শিখানো বিভিন্ন প্রশ্ন করতে লাগলেন। যেগুলো দিয়ে তারা সর্বসাধারণকে বিভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত করে থাকে।

ঘ। ঝিনাইদহে মুরতাদদের সাথে একদিন

২০০৯ সালের ডিসেম্বর মাসে ভগবান গড় গ্রামের (শৈলকূপা থানা ঝিনাইদহ) সফরের কথা বলি। এ সফরে আমাদের রাহবার ছিলেন স্থানীয় কলেজের ছাত্র রাকিবুল ইসলাম ভাই। গিয়ে দেখি সেখানের অনেক মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে। খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত স্থানীয় ঠাণ্ডামাতবর, এলাহী বখশ, বাদশা মিয়া আরো অনেকের সাথে সাক্ষাৎ হলো। তাদের সাথে কথাবার্তা চলছিলো। এক পর্যায়ে আমাদের আলোচনা মুনাজারার (বিতর্কের) রূপ নেয়, তবে তারা মুনাজারায় পরাজিত হয়। বিতর্কে অংশগ্রহণকারী তাদের একজন দাঈ "অমুল মাধুর্য" এর (যে ঐ এলাকায় ইয়াং সোসাইটির প্রধান) সাথে আমার খাতির জমে যায়। আমি তার দাওয়াতি কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলাম। উত্তরে তিনি বললেন, আমরা বই পুস্তক বিলি করি, বুঝাই আর আমাদের প্রোগ্রামগুলোতে দাওয়াত দেই। আমি ফের প্রশ্ন করলাম, আপনারা বই পুস্তকের টাকা পয়সা কোথায় পান ? উত্তরে বললেন, আমরা প্রত্যেকেই আয়ের এক দশমাংশ আল্লাহ'র রাস্তায় দান করি এবং দান করার পর সেদিকে ফিরেও তাকাই না। কেউ আমাদের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করলে তাকেও এই দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করি। আমাদের দাওয়াতি কাজের অর্থযোগান এভাবেই হয়। আর এভাবে সংগৃহীত টাকা দিয়েই আমরা বই পুস্তক কিনি আর বিতরণ করি। আমূল মাধুর্য জানালেন, তিনি একটি প্রাথমিক স্কুল পরিচালনা করেন। সেখানে মুসলমানের সন্তানরাও পড়াশুনা করে। তাদেরকে ইসলাম শিক্ষা নয় বরং খৃষ্টধর্মের দীক্ষা দেওয়া হয়। সেকুলার পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। তিনি এ ধরনের বহু তথ্য দিলেন।

আমি মুসলিম ভাইদের জিজ্ঞাসা করতে চাই, আমরা কয়দিন কয়টি বই আমার প্রতিবেশী অমুসলিমের হাতে তুলে দিয়েছি ? আমরা কতোভাবে আমাদের টাকা খরচ করি, একটি টাকাও কি অমুসলিম ভাইদের পিছনে দাওয়াতের উদ্দেশ্যে খরচ করেছি ?

ঙ। নীলফামারীতে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য

দৈনিক করতোয়ার ২১ এপ্রিল ২০০৮ এর একটি সংবাদ এখানে হুবহু তুলে ধরা হলো –

জলঢাকা প্রতিনিধিঃ নীলফামারী জেলার জলঢাকা উপজেলার খুটামারা, কৈমারী, বালাগ্রাম, মীরগঞ্জ, শিমুলবাড়ী, কিশোরগঞ্জের পুটিমারী ও বড়ভিটার হিন্দুদের অর্থের লোভ দেখিয়ে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করার চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। মেগা ফেলোশিপ চার্চ ও ইভানজেলিক্যাল ফ্রেন্ডস চার্চসহ ৫ টি সংগঠন নগদ অর্থ, চাল, ডাল, শিক্ষা সহায়তা ও ঋণ প্রদানসহ আত্মনির্ভরশীল কার্যক্রমের আড়ালে ধর্মান্তরিত করার কাজ জোরে-শোরে চালাচ্ছে। এ লক্ষ্যে গড়ে তোলা হয়েছে এলাকাজুড়ে অফিস, উপাসনালয় ও শিশুদের জন্য স্কুল। শিক্ষা কার্যক্রমের

অন্তরালে স্কুলগুলোতে চালানো হয় বিভিন্ন সভা ও সমাবেশ। আর প্রোগ্রামের মাধ্যমে খৃষ্টান ধর্ম বুঝিয়ে ধর্মান্তরিত করার কাজ চলে। ওমেগা ফেলোশীপ চার্চ এনজিওর নামে গ্রামের অভাবী লোকদেরকে অর্থসহ বিভিন্ন সহায়তার কথা বলে তাদের তৈরি স্কুল ও অফিসগুলোতে নিয়ে তাদেরকে খৃষ্টান বানানো হচ্ছে। গত ১৬ এপ্রিল খুটামারা ইউনিয়নের ২০ জন মহিলা ও ৪ জন পুরুষ; পুটিমারী, কচুকাটা ও পঞ্চপুকুর ইউনিয়নের ১৮ জন; বড় ভিটা ও কৈমারী ইউনিয়নের ১০ জন মহিলা ও পুরুষের অভাবের সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওমেগা ফেলোশীপ চার্চের কথা বলে দিনাজপুর, বীরগঞ্জ উপজেলার ৭ নং মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের জয়রামপুর গ্রামের মিশন স্কুলে নিয়ে যাওয়া হয়। তার সেখানে গিয়ে খৃষ্টান বানানোর কথা জানতে পারার পর এলাকার মেম্বার ও চেয়ারম্যানকে অবহিত করেন। পরে ঐ ইউপির চেয়ারম্যান গোপাল চন্দ্র দেব শর্মা তাদেরকে উদ্ধার করে নিজ নিজ এলাকায় পাঠিয়ে দেন। বীরগঞ্জ থানার ওসি জানান, গত ১৬ এপ্রিল সংশ্লিষ্ট প্রতারকদের বিরুদ্ধে থানায় একটি জিডি করা হয়েছে। ভুক্তভোগীরা হলো – খুটামারা ইউনিয়নের খালিশা, খুটামারা গ্রামের টনে মামুদের স্ত্রী শাহী, টাটারি স্ত্রী ছারা, শাহারা, সুলতানের স্ত্রী আকলী, রবিউলের স্ত্রী নার্গিস, মৃত কলেজের স্ত্রী অহেদা, লবদ্দিনের স্ত্রী হাওয়া, বিশাদুর স্ত্রী হাওয়াতোন, বকশের স্ত্রী মজিলা, ওসমানের স্ত্রী আসমা, রশিদুলের স্ত্রী ক্যান্টি, ভালের স্ত্রী এপাতন, মৃত টোলার স্ত্রী রহিমা বেগম ও পাদুরার ছেলে লবদ্দিন, মৃত জমালার ছেলে রমজান (ভালে)।

নীলফামারী জেলা প্রশাসন কার্যালয় থেকে ৩০০ গজ দূরে উকিলপাড়ায় অবস্থিত ইউনাইটেড পেন্টিকস্টাল চার্চ অফ বাংলাদেশ নামে একটি সংগঠন নিরবচ্ছিন্নভাবে ধর্মান্তরকরণের কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। সংগঠনটির আঞ্চলিক সমন্বয়ক প্রফুল্ল কুমারের দেওয়া তথ্যমতে শুধুমাত্র গত এক বছরে এই জেলাতেই ৫৩৬ জন হিন্দু ও ৪৫ জন মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করে খৃষ্টান বানানো হয়েছে। কেউ যদি ধর্মান্তরিত হওয়ার পর ঢাকার বাইবেল বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বছর পড়ে তার চাকরি ১০০ ভাগ নিশ্চিত।

চ। পঞ্চগড় জেলায় মিশনারি কর্মীদের নির্লজ্জ কাহিনী

১৭-৮-৯৮ ইং তারিখে দৈনিক সংবাদে প্রকাশিত রিপোর্টের অংশবিশেষ উল্লেখ করা হলোঃ

পঞ্চগড় জেলার দেবীগঞ্জ থানার লক্ষ্মীরাজ গ্রামে দুইজন মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে নারী উন্নয়ন সংস্থা প্রধান আতাউর রহমানকে পুলিশ গ্রেফতার করে। এ সময় ধর্ষিতারা জানান, গত ১লা আগস্ট প্রশিক্ষণের নামে ৯ জন মহিলাকে গ্রামের অফিস লক্ষ্মীরহাটে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে রাত যাপনে তাদেরকে বাধ্য করা হয়। রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ হলে একটি কক্ষে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। রাত আনুমানিক ১ টার দিকে প্রতিষ্ঠানের পিয়ন অনুখুল ও মহিলা কর্মচারী লায়লা খাতুন তাদেরকে জানায়, বড় সাহেব তোমাদের সাক্ষাৎকার নিবেন। তারপর একজন একজন করে পাশের ঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে অবস্থানরত কয়েকজন লোক তাদেরকে রাতভর ধর্ষণ করে। ধর্ষণের পর থেকে পরদিন দুপুর ২টা পর্যন্ত ঐ ঘরে তাদেরকে আটকে রাখা হয়। ছেড়ে দেওয়ার আগে ঘটনাটি ফাঁস না করার জন্য তাদেরকে বিভিন্ন ভয়-ভীতি দেখানো হয়। পড়ে মহিলারা গ্রামে ফিরে নিজ নিজ অভিভাবককে জানালে এবং লোকমুখে ঘটনা জানাজানি হয়ে গেলে বিক্ষুব্ধ জনতা মিছিল বের করে। সেদিন থেকে এ এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে।

তথ্যপঞ্জি – দৈনিক ইনকিলাব, দৈনিক নয়াদিগন্ত, দৈনিক করতোয়া, ধর্মান্তরের খোলা হাওয়া, দেশ জগত।

এ ধরনের বহু ঘটনা গ্রামবাংলায় ঘটছে। কোনটা পত্রিকার খবর হয়, আবার কোনটা হয় না। অনেকেই লোকলজ্জার ভয়ে এনজিওদের বর্বরতা চাপা দিয়ে রাখে।

২। জামালপুর জেলায় খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা

ক। জামালপুরে মুসলমানদের গ্রামে খৃষ্টানদের চার্চ

খবর পেলাম, জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ থানায় বহু মুসলমান খৃষ্টান হয়ে গিয়েছে, তাই ঐ অঞ্চলে সফর করি। প্রথমে মেলান্দহ জামিয়া হুসাইনিয়া মাদ্রাসায় গিয়ে সম্মানিত মুহতামিম, মুফতি শামসুদ্দিন সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমরা উভয়ে মাদারগঞ্জ থানার তেঘুরিয়া ইউনিয়নের কয়লাকান্দি গ্রামে পৌঁছি। সেখানে মুসলমানদের এলাকায় ন্যাজরিয়ান মিশনের একটি বিশাল গির্জা দেখতে পেলাম। ঐ এলাকার অনেক মুসলমানই খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছে। আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে ইসলাম ধর্মে ফিরে আসার দাওয়াত দেই। অনেকে বাইবেল ও কিতাবুল মুকাদ্দাস ফেরত দিয়ে স্বধর্মে ফিরে আসেন এবং তাওবা করেন। এভাবে বিভিন্ন অঞ্চলে মিশনারিগুলো কাজ করে যাচ্ছে। অথচ তাদেরকে হেদায়েতের পথে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে সামান্য অনুভূতিও আমাদের হয় না।

খ৷ জামালপুরের মাদারগঞ্জে কয়েক হাজার খৃষ্টান

৯ই ফেব্রুয়ারী ২০১১ ইং তারিখে মাদারগঞ্জের তেঘুরিয়া ইউনিয়নে আমাদের সফর হয়। সেখানে পৌছার পর স্থানীয় এক খৃষ্টান হাফেজ …. এসে আমাকে বললেন, আমাদের এখানকার প্রবীণ / মুরব্বী (যিনি ধর্মান্তরিত খৃষ্টান) আপনাদের সাথে কথা বলতে চান। তখন আমি অধম, বন্ধুবর মাওলানা নুরুল ইসলাম ও ইঞ্জিনিয়ার আমিনুল ইসলামসহ তার কাছে যাই। গিয়ে দেখি জালাল সাহেব আসন দিয়ে বসে আছেন। সামনে বিছানার উপর ছড়ানো পবিত্র কুরআন, যেন এ কোন সাধারণ বই-খাতা ! আর ডায়েরি দেখে তাতে কি যেন দাগাচ্ছেন। আমরা সালাম দিয়ে প্রথমে কুরআন শরীফটি বিছানা থেকে বুকে উঠিয়ে নিলাম। এরপর তার সাথে দীর্ঘক্ষণ কথা হলো। তার আলোচনার বিষয় ছিল মিশনারিগুলোর শিখিয়ে দেওয়া প্রশ্নগুলো। আমরা তার প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করতে লাগলাম, তিনি আমাদের উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে ব্যর্থ হলে তাদের বস (খৃষ্টান মিশনারিদের প্রধান) জাহাঙ্গীর আলম ওরফে লেবু ডাক্তারকে ফোন করলেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশনের তরজমাতুল কুরআন, কিতাবুল মুকাদ্দাস ও কিছু নোট নিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সাথে কিছুক্ষণ যুক্তিতর্কের পর বললাম, তর্ক কিংবা বিতর্ক কোনটি আমাদের উদ্দেশ্য নয়। বরং সত্যকে পৌঁছে দেওয়াই আমাদের মূল লক্ষ্য। তাই আপনার প্রতি আহবান থাকবে, পুনরায় ইসলাম ধর্মে ফিরে আসবেন।

৩। ময়মনসিংহ জেলা খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা

ক: ৫ হাজার টাকার বিনিময়ে ৫৫ মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা

নয়া দিগন্তের ২৭ মে ২০১০ ইং তারিখের একটি পেপার কাটিং এখানে তুলে ধরা হলোঃ

সাইফুল মাহমুদ, ময়মনসিংহ প্রতিনিধিঃ ……. প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ প্রদানের মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে ময়মনসিংহের ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করণের চেষ্টাকালে স্থানীয় জনতার সহায়তায় একজন বিদেশী ধর্মযাজকসহ তিন ধর্মযাজক ও তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালককে আটক করে পুলিশ। এ সময় ৫৫ মুসলমান নারী ও পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। উদ্ধারকৃত সবাই জামালপুর জেলার সরিষাবাড়ী উপজেলার বাসিন্দা।

উদ্ধারকৃত নারী ও পুরুষেরা জানান, সরিষাবাড়ী উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের আবদুল বারেকের পুত্র রফিকুল, মাজারিয়া গ্রামের রফিক (পিতা – অজ্ঞাত) ও কাশেমের পুত্র রিপন এবং টাঙ্গাইল জেলার ধনবাড়ি উপজেলার বাসনিয়োগী গ্রামের আসেক আলীর পুত্র শামসু, তাদের পাঁচ হাজার টাকা করে ঋণ দেওয়ার কথা বলে। দুই সপ্তাহ ধরে তাদের বলা হচ্ছে যে, ঋণ নেওয়ার জন্য সবাইকে ময়মনসিংহে যেতে হবে। এই আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সকালে তাদের সরিষাবাড়ী উপজেলার পিংনা এলাকায় জড়ো করা হয়। সেখান থেকে তাদের একটি বাসযোগে ময়মনসিংহে নিয়ে আসা হয়। দুপুর নাগাদ বাসটি শহরের ব্রহ্মপুত্র নদের ব্রিজের কাছে পৌঁছে। এখানে একজন বিদেশীসহ তিন ব্যক্তি তাদের বাস থেকে নামিয়ে ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে নিয়ে যান। এদের মধ্যে কয়েকজনকে নদের পানিতে গোসল করায় আর তাদের জিজ্ঞেস করে – তোমরা কি যীশুকে বিশ্বাস করো ? এমন প্রশ্ন শুনে অনেকেই জানতে চান, ঋণ নিতে হলে যীশুকে বিশ্বাস করতে হবে কেন ? তখন শামসু তাদেরকে চুপ থাকার কথা বলে ধমক দেয়। এমন পরিস্থিতিতে কেউ কেউ পিছু হটতে থাকে। এ সময় নদের তীরে একজন মওলানাকে দেখে ঋণ প্রত্যাশীরা জানতে চান, ঋণ নেওয়ার সাথে যীশুকে বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি ? তখন হুজুর তাদের কথা শুনে বিষয়টি বুঝতে পারেন আর স্থানীয় লোকদের সাথে বিষয়টি নিয়ে কথা বলেন। এ সময় বেশ কিছু লোক জড়ো হয়। তারা বিষয়টি পুলিশকে অবহিত করলে কোতোয়ালী থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে ইউনাইটেড পেন্টিকেস্টল চার্চ অব বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) ফাদার রেভা সমর সাংমা ও ফাদার রেভা প্রদীপ সাংমাসহ তাদের নিয়োগপ্রাপ্ত দুই পালক শামসু ও রফিকুলকে আটক করে। এ সময় ৩৫ নারী ও ২০ পুরুষকে উদ্ধার করা হয়। তাদের সাথে ১৫ শিশুও রয়েছে। তারা সবাই মুসলিম দরিদ্র পরিবারের লোক।

এ দিকে ইউনাইটেড পেন্টি কেস্টল চার্চ অফ বাংলাদেশের চেয়ারম্যান (প্রধান ধর্মযাজক) আমেরিকান নাগরিক ফাদার রেভা জেমস অরভিন নয়াদিগন্তকে জানান, আমরা কাউকে জোর করে ধর্মান্তরিত করি না। আমাদের কোন এনজিও নেই। আমরা কাউকে ঋণ প্রদানও করি না, আমরা তাদেরকে টাকা দেওয়ার কথাও বলিনি। তবে তিনি আগতদের কাছে জানতে চান, তারা যীশুকে বিশ্বাস করে কিনা, তার ব্যাপটিস্ট তরীকা কিনা। তখন জবাবে তারা বলেছেন, হ্যা, এ কথা বলার পরই তাদের গোসল করতে বলা হয়। কেন গোসল করতে বলা হলো ? এ প্রশ্নের কোন জবাব দেননি তিনি। তিনি বাংলায় আরো বলেন, আমার মন খুব খারাপ। ওরা অ্যাকশন নিবে, এসব আমার অপছন্দ।

খ: ৩০ হাজার গারো উপজাতি খৃষ্টান হয়েছে

ফাদার হুমরিক নামক এক খৃষ্টধর্ম প্রচারক বাংলাদেশের ময়মনসিংহে দীর্ঘ ৪০ বছর যাবত কর্মরত। তার প্রচেষ্টায় ৩০ হাজার গারো উপজাতি খৃষ্টান হয়েছে। আর আমি আপনি কয়জন অমুসলিমকে মুসলমান বানাতে পেরেছি ? এ দেশে তো কোন মুসলমান ছিল না। আমরা মুসলমান হয়েছি কিভাবে ? আমাদের আকাবিরগণ এদেশে এসেছেন ইসলাম প্রচার করার জন্য, তারা প্রচার করে চলে যাননি। দেখুন, সিলেটে শাহজালাল ইয়ামানী, খান জাহান আলী, কারামত আলী জৈনপুরী প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীন আমৃত্যু এ দেশে ইসলাম প্রচারের কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন।

গ: খৃষ্টান প্রচারকের সাথে বিতর্ক ও দাওয়াত

হালুয়া ঘাটের এক চার্চে ফাদারের সাথে আমরা কয়েকজন দেখা করি। প্রথমে তাকে সালাম দিলাম।

যুবায়েরঃ আসসালামু আলা মানাত্তিবাআল হুদা।

ফাদারঃ ওয়া আলাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।

যুবায়েরঃ কেমন আছেন ?

ফাদারঃ ভালো আছি, আপনি কেমন আছেন ?

যুবায়েরঃ আলহামদুলিল্লাহ, ভালো আছি। আমরা আপনাদের চার্চ দেখতে এসেছি, দেখতে পারি কি ?

ফাদারঃ হ্যা, অবশ্যই দেখতে পারেন।

যুবায়েরঃ (চার্চ দেখতে দেখতে কিছু দাওয়াত) ফাদার সাহেব, দেখুন, আমাদের সমাজে একটি বড় ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো, আমরা যখন কোন হিন্দু বা খৃষ্টান ভাইদের দেখি, তাকে বিধর্মী মনে করে তার থেকে দূরে থাকি। হিন্দু খৃষ্টান ভাইরাও তাই করে। আসলে এমন করা ঠিক নয়। আমরা সকলেই মানুষ। আপনার কপালে লেখা নেই যে, আপনি খৃষ্টান। তদ্রূপ আমার কপালেও মুসলমান লেখা নেই। আমার চামড়া কাটলে রক্ত লাল হবে, আপনার চামড়া কাটলেও তাই। এর ব্যত্যয় হবে না। মূলত এই পার্থক্য আমরা নিজেরাই করে নিয়েছি। আমাদের মালিক কোন পার্থক্য করেননি। আমাদের প্রভু আল্লাহ সকলকে লক্ষ্য করে বলেন – "হে মানুষ সকল, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের উপাসনা করো, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন ……" এখানে মালিক কোন ভাগ করেননি। এই মালিক এক, তার সাথে কোন শরীক নেই।

ফাদারঃ হ্যা, হ্যা, আপনি ঠিকই বলেছেন। আমাদের বাইবেলেও তা আছে।

যুবায়েরঃ আচ্ছা, আপনার কাছে অনেক কিছু জানা যাবে। আমি জানতে চাই, বাইবেল কি আল্লাহ'র কিতাব ?

ফাদারঃ হ্যা, এটা আল্লাহ'র কিতাব। আপনাদের কিতাবে যাকে তাওরাত, ইনজিল নামে অভিহিত করা হয়েছে।

যুবায়েরঃ বলুন তো, মানুষের লেখা চিঠি কি আল্লাহ'র কালাম হতে পারে ?

ফাদারঃ না, কখনো হতে পারে না।

যুবায়েরঃ আপনার দাবী অনুযায়ী মানুষের কথা আল্লাহ'র কিতাবে স্থান পেতে পারে না, অথচ নতুন নিয়মের ২৭ অধ্যায়ের মধ্যে ১৪ টি অধ্যায় হলো সেন্ট পোলের চিঠি। আর সেন্ট পোল যীশুকে আসমানে উঠিয়ে নেওয়ার অনেক পরে এসেছেন। সুতরাং তার চিঠিগুলো আল্লাহ'র কালাম হতে পারে না। প্রশ্ন জাগে, তা কিভাবে আপনাদের বাইবেলে স্থান পেলো!

ফাদারঃ উনি তো পবিত্র আত্মার সাহায্যে লিখেছেন।

যুবায়েরঃ যীশু তো বাংলাদেশীদের জন্য নবী নন। কারণ বাইবেলের মথির ২৪:১৫ তে আছে, যীশু বলেন – "আমি তো শুধু বনী ইস্রাইলের হারানো মেষদের জন্য প্রেরিত হয়েছি।" আর আমরা বাংলাদেশীরা বনী ইস্রাইলের লোক নই।

ফাদারঃ আমি এখন বলতে পারবো না, পরে আরো পড়াশোনা করে আপনাকে জানাবো।

যুবায়েরঃ দেখুন, আমাদের মাঝে আরেকটি ভুল বুঝাবুঝি আছে, তা হলো – হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাদের নবী ? যদিও আপনারা তাকে মুসলমানদের নবী আর আমরা আমাদের নবী বলি। কিন্তু কুরআনে বলা হয়েছে – তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। সুতরাং কুরআনের ভাষ্যানুযায়ী তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সকলের নবী। তাই আপনাকে আহবান করবো তার (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতি ঈমান আনবেন এবং কুরআনের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে তদনুযায়ী আমল করবেন।

ফাদারঃ আমার অনেক ইচ্ছা যে, কুরআন শরীফ পড়বো। একবার কুরআন শরীফ কিনতে গিয়েছিলাম, কিন্তু খৃষ্টান হওয়ায় আমার কাছে কুরআন শরীফ বিক্রি করেনি।

যুবায়েরঃ আমি আপনার কাছে একটি কুরআন শরীফ পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করবো ইন শা আল্লাহ। আজকে আসি। আসসালামু আলাইকুম।

৪। নেত্রকোনা জেলায় খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা

নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুরসহ বিভিন্ন এলাকার গারোদের খৃষ্টান বানাতে সক্ষম হয়েছে। নজরুল ইসলাম নামক প্রত্যক্ষদর্শীর দেওয়া তথ্যমতে নেত্রকোনা জেলায় "মৌ" নামক স্থানে যাওয়ার পথে দুটো মুসলমান ইউনিয়ন খৃষ্টান ইউনিয়নে পরিণত হয়েছে। অথচ সেখানে ৫ টি মাদরাসা রয়েছে।

৫। চট্টগ্রামে খৃষ্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার অপতৎপরতা

দৈনিক ইনকিলাবের এক সাংবাদিক সাদেক হুসেন তার একটি গবেষণামূলক প্রতিবেদনে বলেছেন, রাঙ্গামাটি থেকে দুই দিনের দূরত্বে ভারতের সীমানার কাছে একটি ইউনয়ন আছে "সাজেক"। এ এলাকায় ২০ হাজার মানুষ আছে যারা ইংরেজিতে কথা বলে। গিটার বাজিয়ে ইংরেজি গান গায় আর ছেলে-মেয়েরা জিন্স প্যান্ট পড়ে। ইউরোপীয় স্টাইলে তাদের জীবনধারা।

দৈনিক ইনকিলাবের প্রকাশিত একটি সূত্রমতে কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রভৃতি এনজিও দরিদ্র ও অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে সেখানকার বিপুল সংখ্যক মানুষকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জেলায় বসবাসকারী উপজাতিরা খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হচ্ছে এবং সেখানে রয়েছে তাদের সুদূরপ্রসারী কর্মকাণ্ড। আর এ কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের কোন ঘটনা ঘটলেই পাড়া-পড়শি জানার আগেই তা পৌঁছে যায় বিশ্বব্যাপী। ঘটনাস্থলে থানার পুলিশ পৌঁছার আগেই ওয়াশিংটন, লন্ডন, টোকিও, ভ্যাটিকান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে বিবৃতি আসতে থাকে।

ক। জুমল্যান্ড পরিকল্পনা

একাধিক আন্তর্জাতিক খৃষ্টানসংস্থা পার্বত্য চট্টগ্রামকে একটি আলাদা রাষ্ট্র করার চক্রান্ত চালাচ্ছে। মুসলিম রাজ্যের বুকে জুমল্যান্ড নামে একটি খৃষ্টানরাজ্য প্রতিষ্ঠা করবে। যেমনটি ইন্দোনেশিয়ায় "পূর্ব তিমুর" নামে প্রতিষ্ঠা করেছে। বাংলাদেশের হৃৎপিণ্ডতুল্য খনিজ সম্পদের অপার সম্ভাবনায়ময় এক দশমাংশ অঞ্চল তথা পার্বত্য এলাকাকে ঘিরে তাদের এ নয়া রাষ্ট্র তৈরির পরিকল্পনা। ৭ মে ২০০৬ ইং তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, সন্তু লারমার পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে স্বাধীন জুমল্যান্ডের পরিকল্পনা থাকলেও মিশনারিদের টার্গেট ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য দক্ষিণ এশিয়ায় একটি খৃষ্টান রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটানো।

অবশ্য প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ মনে করেন, ইহুদি-খৃষ্টান বিশ্বের লক্ষ্য শুধু পার্বত্য চট্টগ্রাম নয়, এর সাথে ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি বৃহৎ খৃষ্টরাষ্ট্রের জন্ম দিবে। সে কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যগুলোতেও বিশেষ করে ঐ সব অঞ্চলের উপজাতিদের মাঝে একই ধরনের মিশনারিগোষ্ঠীর জোরালো কর্মতৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাদের মতে, এদের লক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলে খৃষ্টানরাষ্ট্র সৃষ্টির মাধ্যমে পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সাম্রাজ্যবাদ শক্তিগুলোর প্রতিরক্ষাবলয় সৃষ্টি করা। ভূ-কৌশলগত দিক থেকে বিষয়টি তাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের পার্বত্য এলাকা তথা মিজোরাম, অরুনাচল, নাগাল্যান্ড, ত্রিপুরা, মনিপুরে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য এলাকায় দেশীয় ও ইউরোপীয় খৃষ্টান মিশনারিদের দ্বিমুখী তৎপরতায় ধর্মান্তরিত করার কাজ পুরোদমে চলছে। তাদের পরিকল্পনা হলো, যখন এ দুই পার্বত্য এলাকার অধিকাংশ মানুষ খৃষ্টান হয়ে যাবে তখন সন্তু লারমা গং গণভোটের দাবী তুলবে। এদিকে ইহুদি-খৃষ্টানদের ক্রীড়নক জাতিসংঘ গণভোটের পক্ষে চাপ সৃষ্টি করবে। এভাবে প্রতিষ্ঠা করবে তাদের স্বপ্নের স্বাধীন খৃষ্টরাষ্ট্র।

আমরা মুসলমানরা যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি না পাল্টাই, তাদের কাছে ইসলামের আমানত না পৌঁছে দেই, তাহলে আমাদেরও ভোগ করতে হবে পূর্ব তিমুর ও দক্ষিণ সুদানের পরিণতি।

খ্রিস্টান মিশনারীরা চট্টগ্রামকে বিভিন্ন কারণে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। দৈনিক ইনকিলাব'র এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, খ্রিস্টান মিশনারী ও ইউএনডিপিসহ পশ্চিমা এনজিওগুলোর যেসব প্রতিনিধিরা পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করছেন তাদের নিয়ন্ত্রণ সরকারের হাতে নেই। অর্থসহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে এই অঞ্চলকে খ্রিস্টান অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে।

ফিলিস্তিন থেকে ইহুদীরা যেভাবে আরবদের বিতাড়িত করেছিল, সেই কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রামে। ভারতের নাগাল্যান্ডকে রাজধানী করে পার্বত্য চট্টগ্রাম নিয়ে পশ্চিমারা একটি খ্রিস্টান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য নিয়েই দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তৃত করেছে। (১৮ জুন ২০১৩ ইনকিলাব)

দৈনিক আমার দেশ-এ প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়েছে, গত ২০ বছরে সেখানে ১২ হাজার উপজাতীয় পরিবারকে ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানো হয়েছে। ওই রিপোর্টের তথ্য অনুযায়ী, তিন পার্বত্য জেলা খাগড়াছড়ি, বান্দরবান ও রাঙামাটিতে বর্তমানে ১৯৪টি গীর্জা উপজাতিয়দের ধর্মান্তরিত করে খ্রিস্টান বানানোর ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা পালন করছে।

খাগড়াছড়ি জেলায় আছে ৭৩ টি গীর্জা। ১৯৯২ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত এ জেলায় ৪ হাজার ৩১ টি পরিবার খ্রিস্টান হয়েছে।

বান্দরবান জেলায় গীর্জা আছে ১১৭ টি। এখানে একই সময়কালে খ্রিস্টান হয়েছে ৬ হাজার ৪৮০টি উপজাতীয় পরিবার।

রাঙামাটিতে ৪টি চার্চ খ্রিস্টান বানিয়েছে ১ হাজার ৬৯০টি উপজাতীয় পরিবারকে। এগুলো তুলনামূলকভাবে কম, তাদের প্রায় শতভাগ খ্রিস্টান হয়ে গেছে অনেক আগেই।(এম. এ নোমান, আমার দেশ, ১২.০৮.২০১১ইং)

ঝ। আমাদের করণীয় [৪], [৭]

খৃষ্টান মিশনারির ধর্মান্তরের শিকার হয়ে অনেক সাধারণ মুসলমান চিরদিনের জন্য সরলপথ হারিয়ে জাহান্নামী হচ্ছে। প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রচার করে মুসলিম মনন-মস্তিস্ককে খৃষ্টবাদের ছাঁচে নেওয়ার কৌশল করছে। এমতাবস্থায় প্রিয় ছাত্রভাইদের কর্তব্য, মিশনারিগুলোর তৎপরতার অবগতি ও তা দূর করার পন্থা চর্চার মাধ্যমে তাদের খৃষ্টরাজ্য গড়ার স্বপ্নকে দুঃস্বপ্নে পরিণত করা এবং তাদের অপতৎপরতার গতিকে রুখে দেওয়া। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে কয়েকটি কাজ করা যেতে পারে –

(১) মিডিয়াঃ মিডিয়ার মাধ্যমে সত্যকে সত্য হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরা, যাতে তারা মিডিয়ায় অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের ক্ষতি সাধনে ব্যর্থ হয়।

(২) রাজনীতিবিদদের সতর্ক করাঃ খৃষ্টান মিশনারিগুলো এ দেশের রাজনৈতিক ফিল্ড নিজেদের দখলে আনার জন্য রাজনীতিবিদদের মগজ ধোলাই কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। তারা নেতাদের কাছে উপঢৌকন ও উপহার পেশ করে নিজেদের পক্ষে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে এবং অর্থ-কড়ির মাধ্যমে স্বার্থ হাসিলের জোর তৎপরতায় লিপ্ত হচ্ছে। এর উৎকৃষ্ট নজির জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ও ফতোয়া বিরোধী রায় বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা। তাদের এ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করতে আমাদের উচিত রাজনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, সরকারী বেসরকারি সিনিয়র কর্মকর্তা ও সব শ্রেণীর লোকদের উক্ত বিষয়ে সরাসরি ও চিঠির মাধ্যমে সতর্ক করা।

(৩) লেখালেখিঃ আজ লেখালেখি ও প্রকাশনার দিক দিয়েও তারা পিছিয়ে নেই বরং একধাপ এগিয়েই আছে। খৃষ্টান মিশনারিগুলো মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বই লিখে প্রচার করছে। তার মধ্যে কয়েকটি বইয়ের নাম আমি আপনাদের সামনে পেশ করছি – "গুনাহগারদের জন্য বেহেশতের পথ" (এই নামটির শুরুতে আরবিতে লেখা – "ত্বারিকুল জান্নাতি লিল মুযনিবি"), বেলালের লেখা "আপনার জন্য আমার অন্তরের কথা", "গুনাহ থেকে মুক্তির পথ", "কুরআনের আলোকে জান্নাতের পথ" ইত্যাদি। এগুলো হলো মুসলমানদেরকে উদ্দেশ্য করে লেখা খৃষ্টানদের বই। কিন্তু আফসোসের সাথে বলতে হয়, খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে কিংবা হিন্দুদের উদ্দেশ্যে লেখা কয়টি বই আছে আমাদের ?

(৪) চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত: আমাদের প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অমুসলিম নেতাদের চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত দিতেন। আপনিও সেই সুন্নাত আদায়ের লক্ষ্যে দেশের অমুসলিম এম.পি. মন্ত্রীকে চিঠির মাধ্যমে দাওয়াত প্রদান করতে পারেন। আপনার চিঠিটা পাওয়া তাদের হক।

ভেবে দেখুন, কিছু করতে পারেন কিনা।

আমার ভাই, আমাকে একটি বই দেখান যে, এই বইটি খৃষ্টানদের উদ্দেশ্যে লিখে তাদের মাঝে প্রচার করা হচ্ছে।

ভাই আমার, উঠুন, জাগুন, প্রতিজ্ঞা করুন আর টার্গেট বানান যে, আপনিও কিছু লিখবেন। অমুসলিমদের উদ্দেশ্যে লিখবেন আর তাদের কাছে প্রচার করবেন। (নোটঃ এ বিষয়ে বেশ কিছু আলিমের লিখিত বই রয়েছে, এর মধ্যে অন্যতম একটি বইয়ের নাম আর্টিকেলের শেষে উল্লেখ করা হলো) আজ তারা আমাদের দেশের লেখকদের কিনে নিয়েছে আর তাদেরকে ভ্রান্ত মতবাদটি বুঝাতে সচেষ্ট হয়েছে এবং বড় বড় লেখকদের কলম থেকে তাদের মতবাদ ও দাওয়াত প্রচার করাচ্ছে। আমরা কি কখনো সেই কলামিস্টদের কাছে গিয়েছি ? ইসলামের হক্কানিয়াত তাদের সামনে উপস্থাপন করেছি ? আমরা কি তাদের বুঝিয়েছি যে, আখিরাতের ফিকির করে, ভবিষ্যৎকে চিন্তা করে আপনাকে ইসলামের পক্ষে লিখতে হবে ? উত্তর যদি "না" হয়, তাহলে তাদের কাছে কে যাবে ? কারা তাদেরকে বুঝাবে ? তাদের কাছে কি দাওয়াত পৌঁছানোর জন্য আসমান থেকে কোন ফেরেশতা আসবে ? না বন্ধু, না। আমাকে-আপনাকেই যেতে হবে।

উঠুন বন্ধু, আর কতোদিন ঘুমিয়ে থাকবেন, ঘুমিয়ে থাকার আর সময় নেই।

(৫) উলামায়ে কেরামের করণীয়:

উলামায়ে কেরাম হলেন ধর্মীয় অভিভাবক। আর ধর্মীয় অভিভাবকদের দায়িত্ব তো আরো বেশী। ছকে বাঁধা দ্বীনি খেদমতে আবদ্ধ হয়ে থাকা তাদের শান নয়। সমাজের গভীরে অনুপ্রবেশকারী মিশনারি ও তাদের তাবেদার এনজিওদের অপতৎপরতার প্রতি সুতীক্ষ্ণ নজর রাখা তো তাদের ফরয কর্তব্য।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লক্ষ কোটি উম্মত সমাজের মিশন-আখড়ায় বন্দী হয়ে খৃষ্টান জগতে পাচার হয়ে চিরতরে জাহান্নামে ঝাঁপ দিচ্ছে – এ নিয়ে তাদের মাথা ব্যাথা থাকা প্রয়োজন। যারা দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে অহর্নিশ মানবেতর জীবন যাপন করছে, যাদের রোগে শোকে সান্ত্বনা দেওয়ার কেউ নেই, তাদের পাশে দাঁড়াবার মানসিকতা গড়ে উঠা আজ সময়ের দাবী।

আমরা যতটা রসমের কাছে পরাজিত ততটা হাজতের কাছে পরাজিত নই। আমাদের এই মুহূর্তে দরকার কিছু দায়ী, যারা এরতেদাদের তুফানে জর্জরিত প্রতিটি এলাকায় বসে যাবে। এর জন্য খুব মেধাবী হতে হবে এমন নয়। হতে হবে পরিশ্রমী ও মুখলিস। হতে হবে দ্বীনের প্রয়োজনকে নিজের প্রয়োজনের উপর প্রাধান্য দেয়ার মানসিকতার অধিকারী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে শাহজালাল ইয়ামানী, খান জাহান আলী পর্যন্ত এবং এর পরেও এক বিশাল জামাত দ্বীনের জন্য ছিন্নমূল হয়েছেন। ইসলামের মৃত এই সুন্নতকে যিন্দা করলে কাদিয়ানী ও মিশনারী ফেতনার চলমান তুফান ইনশাআল্লাহ থেমে যাবে। কারণ আমাদের কাছে কুরআন-সুন্নাহ, আল্লাহ্র আযমত ও আখেরাতের অনুভূতি এবং সীরাতে সাহাবার মত পুঁজি ও পাথেয় আছে, যা অন্য কারোর কাছে নেই। এখন প্রয়োজন বিধি মত কাজে লাগানো। দেশে কয়েকটি জায়গায় এর মাধ্যমেই আল্লাহ তাআলা আমাদের সফলতা দিয়েছেন। এ জন্য দরকার ইলম ও হেকমত, ইখলাস ও আখলাক এবং জনসাধারণকে সাথে নিয়ে চলার যোগ্যতা। আর এই সকল গুণের জন্য প্রয়োজন এখলাস ওয়ালাদের সোহবত ও শায়খে কামেলের সাথে সর্বদা যোগাযোগ রক্ষা করা।

যেহেতু এ সকল বাতিল ফেরকা তাদের দায়ীদের প্রশিক্ষণ দেয়, তাই আমাদের দায়ীদেরও কিছু প্রশিক্ষণ দরকার। বড়রা চিন্তা করবেন, এমন হতে পারে কি না যে, এক বছরকে তিন ভাগ করে একভাগ তিন চিল্লায়, একভাগ সোহবতে, একভাগ মুতালাআয় লাগানোর পর এমন আক্রান্ত এলাকায় বসিয়ে দেয়া হল। ইখলাস ও ইতকানের সাথে কাজ করলে আল্লাহ তাআলা তার সাহায্যের ওয়াদা সেখানেও বাস্তবায়ন করবেন ইনশাআল্লাহ। আমাদের ফারেগীনদের একটি অংশও যদি এ কাজে চলে আসেন তাহলে মুসলমানের সন্তান মুসলমানিত্ব নিয়ে কবরে যেতে পারবে। দেখুন, পূর্বতীমুর আর দক্ষিণ সুদানের তিক্ত পরিস্থিতি আমাদের সামনে রয়েছে। আল্লাহ হেফাযত করুন, ঐ অবস্থার সৃষ্টি হলে আমাদের সাধারণ কাজগুলোও অস্তিত্বের সংকটে পড়বে। একবার হাত থেকে বের হওয়ার পর সেটা আর ফিরে আসে না। স্পেনকে মুসলিম উম্মাহ আর ফিরে পায়নি। বাহ্যত সম্ভাবনাও দেখা যাচ্ছে না। তাই সময় থাকতেই উম্মতের হেফাজতের ফিকির করতেই হবে। কম শ্রমে স্বল্প উপকরণে অধিক ফল পেতে হলে উপরের এ পন্থাকে কার্যকর ও নিরাপদ মনে হয়।

আমাদের দ্বীনী প্রতিষ্ঠানগুলোতে

التخصص في الرد على الفرق الباطلة

তথা 'কিসমুদ দাওয়াহ' গুরুত্বের সাথে নেয়া দরকার। এখন এক একটি প্রতিষ্ঠানকে এক একটি আক্রান্ত এলাকার দায়িত্ব নিতে হবে। কিছু দায়ী বেছে বেছে প্রস্তুত করতে হবে। মাদরাসা যদি তাদের দুনিয়াবী হাজতের দায়িত্ব গ্রহণ করে তাহলে এ কাজ আরো সহজে হতে পারে। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন।

কতো ভালো হতো, যদি উলামায়ে কেরাম নিম্ন বর্ণিত বিষয়ের প্রতিও মনোযোগী হতেন –

(ক) সকল মুসলিম, বিশেষ করে নতুন প্রজন্মের সন্তানদের অন্তরে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস মৌলিকভাবে গেঁথে দেওয়া। আর তা করতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থা ও সাধারণ শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, সকল প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাগারে সরকারী ও জাতীয় ভিত্তিতে।

(খ) মুসলিম জাতির সর্বস্তরে দীনের বাস্তব জ্ঞানের সম্প্রচার এবং হৃদয়ে দীনী আত্মমর্যাদা, পবিত্রতা ও মর্যাদাবোধ পুরোপুরি জাগ্রত করা।

(গ) খ্রিস্টান ধর্ম প্রচারের যাবতীয় উপকরণ: ফিল্ম, পত্র-পত্রিকা, প্রকাশনা-প্রচারণা ইত্যাদির প্রবেশ পথ চিহ্নিত করতঃ এগুলোর অনুপ্রবেশ নিষিদ্ধ করা এবং এর অবাধ্যতায় দমনমূলক শাস্তিবিধান করা।

(ঘ) জনসাধারণকে তাদের পাতানো ফাঁদ থেকে বাঁচানো ও সাবধান করার জন্য খ্রিস্টানদের মিশনের ভয়াবহতা, অপকৌশল ও পন্থাবলী সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অবগত থাকা ও সচেতনতা সৃষ্টি করা।

(ঙ) মুসলিমের জীবনের সকল মৌলিক দিকগুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করা, বিশেষ করে স্বাস্থ্যগত দিক ও শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে যত্নবান থাকা, কেননা বাস্তবে যা ঘটছে তা হলো খ্রিস্টানরা এ দুটি মারাত্মক পথেই মানুষের অন্তরে ও মগজে ঢুকে পড়েছে।

(চ) প্রত্যেক মুসলিমের উচিৎ, সে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে যে কোনো পরিস্থিতির শিকার হোক না কেন, প্রতিটি ক্ষেত্রে তার দীন ও আকীদাকে মজবুতভাবে ধারণ করা এবং সে ব্যক্তিগত ও তার অধীনস্থদের জীবনে ইসলামী নিয়ম-নীতি ও নির্দেশাবলীকে যতদূর সম্ভব সু-প্রতিষ্ঠিত করা, যার ফলে তার বাড়ীর প্রতিটি সদস্য যেন ব্যক্তিগতভাবে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত ঈমান, আকীদা ও চরিত্র বিনষ্টকারী সংগ্রামের মুকাবিলায় সুরক্ষিত থাকতে পারে।

(ছ) বিশেষ জরুরি প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা বা এমন প্রয়োজনীয় শিক্ষা যা মুসলিম রাষ্ট্রসমূহে অবর্তমান, এমন উদ্দেশ্য ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ও পরিবারের কাফির রাষ্ট্রে ভ্রমণ করা থেকে সাবধান থাকা। আর উক্ত প্রয়োজনে যদি ভ্রমণ করতে হয় তবে মুসলিমদের বিরুদ্ধে পরিচালিত ধর্মীয় ফিতনা ও সংশয় প্রতিহত করার প্রস্তুতি সাথে থাকতে হবে।

(জ) মুসলিমদের মধ্যে সামাজিক সহযোগিতা, সৌহার্দ্য ও সংহতি গড়ে তুলতে হবে; যার ফলে মানবাধিকার রক্ষিত হবে এবং মুসলিমদের যাবতীয় অভাব দূরীকরণে সমবায়ভিত্তিক জনকল্যাণমুখী দাতব্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে, এর ফলে তাদের অভাব ও দারিদ্র বিমোচনের নামে খ্রিস্টানদের কালো থাবা তাদের ওপর প্রসারিত হবে না।

(ঝ) সরাসরি খৃষ্টানদের দাওয়াত দেওয়া, বিশেষ করে যারা খৃষ্টধর্মের প্রচারক।

(ঞ) ব্র্যাক, আশা ইত্যাদি স্কুলের মোকাবেলায় মসজিদে মসজিদে মক্তব প্রতিষ্ঠা করা এবং প্রতিটি গ্রামে একটি করে ইসলামিক কিন্ডারগার্ডেন স্কুল কায়েম করা।

(ট) ব্র্যাক স্কুল, আনন্দ স্কুল ইত্যাদি স্কুলে মুসলমান বাচ্চাদের ইসলামী শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্মীয় শিক্ষকের ব্যবস্থা করার চেষ্টা করা।

(ঠ) অমুসলিমদের কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার জন্য ছাত্রদেরকে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা।

(ড) চট্টগ্রামের উলামায়ে কেরামদের প্রতি মুফতি জুবায়ের আহমাদের আবেদন

চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এই অঞ্চলকে "মাদখালুল ইসলাম" বা ইসলামের প্রবেশ পথ বলা হয়। এই পার্বত্য এলাকায় বাস করে ৪৫ টি জাতি গোষ্ঠীর প্রায় ২০ লক্ষ মানুষ। এতো কাছে হওয়া সত্ত্বেও বিশাল এই হিল বেল্টে আমরা ইসলামের আলো পৌঁছাতে পারিনি। অথচ সাত সমুদ্র তের

নদী পার হয়ে খৃষ্টান মিশনারিগুলো এদেশে এসে পাহাড়ের ভিতরে জঙ্গলের গভীরে গিয়ে এগুর্ণা, চাকমা, মারমা, তনচৈঙ্গা, চাক, ক্ষুমি, ভৌম ইত্যাদি উপজাতির হাজার হাজার মানুষকে খৃষ্টান বানিয়েছে। সেখানে মসজিদ তৈরি হওয়ার পূর্বে খৃষ্টানদের গির্জা তৈরি হয়েছে। কি আশ্চর্য! চট্টগ্রামের মুসলমান যারা দাঈ ইলাল্লাহ হিসেবে পরিচিত তাদের চোখের সামনেই উপজাতি ভাইদেরকে – যাদের কোন ধর্ম নেই, মিশনারিরা খৃষ্টান বানিয়ে ফেলছে। বলতে হবে, এটা আমাদের ব্যর্থতা। পাহাড়ের ভিতর খৃষ্টানরা স্কুল বানিয়ে, ঘর নির্মাণ করে, খাদ্য দিয়ে তাদেরকে বিনামূল্যে অন্ন, শিক্ষা ও বাসস্থানের মতো মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমরা মাদ্রাসা ঘেঁষে আরেক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করছি, কিন্তু পাহাড়ের মধ্যে কোনদিন একটি মাদ্রাসা বানানোর উদ্যোগ নেইনি। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এই ফিকির নিয়ে এগিয়ে আসার তাওফিক দান করুন, আমীন।

(৬) ব্যবসায়ী ও বিত্তবানদের করণীয়:

আল্লাহ আপনাদের অর্থ-সম্পদ দিয়েছেন আল্লাহ'র রাস্তায় খরচ করার জন্য। আজ খৃষ্টানরা যদি তাদের আয়ের ১০ ভাগের ১ ভাগ তাদের মিথ্যা ধর্ম প্রচারের জন্য খরচ করতে পারে, তাহলে আমরা কেন আমাদের সত্য ধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রে খরচ করতে পারবো না। আমাদের তো বরং দ্বীন প্রচারের জন্য প্রয়োজনে সমস্ত সম্পদ ব্যয় করার মন-মানসিকতা থাকতে হবে।

ঞ। খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব [৮]

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের শেষ দিকে একটি জেলার নাম কুড়িগ্রাম। আয়তন ২২৪৫.০৪ বর্গ কিলোমিটার। জনসংখ্যা ২২৫০৯৭৪ জন। উপজেলা ৯ টি, ইউনিয়ন ৭২ টি, গ্রাম ১৮৭২। বেশ বড় একটি জেলা হওয়া সত্ত্বেও জাতীয় উন্নয়নের ছোঁয়া তেমন পায়নি। এ জেলারই একটি গ্রাম চিটপাইকেরছড়া। যা ভুরুঙ্গীমারী উপজেলার একেবারেই শেষদিকে ভারত সীমান্তের কাছে। দুর্গম ও উলামায়ে কেরামের পদচারণা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ধর্মান্তরকারী এনজিওগুলোর অপতৎপরতার অনুকূল জায়গা। অজ্ঞতা ও দারিদ্র্যে জর্জরিত উত্তরের অনেক জনপদের মত চিটপাইকেরছড়াতেও প্রবেশ করেছে ঈমান হরণকারী একটি এনজিও। প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ নামে এ এনজিওটি ২০০০ সাল থেকে সেবার খোলসের নিচে তাদের নোংরা উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ধর্মান্তরকরণের লক্ষ্য হাসিলের জন্য তারা প্রতিষ্ঠিত করেছে এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুল নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। পল্লী সমাজে নিরক্ষতার বিরুদ্ধে যুদ্ধের মোহনীয় শ্লোগানের আড়ালে অব্যাহত রেখেছে ঈমান লুটের ধারা।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে ২০১৪ সালের বিশ্ব ইজতেমা থেকে বিশোধিক সাথীর একটি জামাত নিয়ে ঢাকার প্রসিদ্ধ একজন হার্টের ডাক্তার ভুরুঙ্গামারী সফর করেন। তার বর্ণনা শুনেই আমাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, তাহলে তার না জানি কী হয়েছে। চিল্লার ১৭ দিন তারা একই মসজিদে দিনে ঘাম ঝরিয়েছেন আর রাতে অশ্রু ঝরিয়েছেন। আর ভেবেছেন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে কীভাবে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, যে উম্মতের জন্য তিনি নিজ আত্মীয়-স্বজন মাতৃভূমি সবই ত্যাগ করেছেন। মা যেমন তার সন্তানের জন্য সব উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয়, হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর উম্মতের জন্য তার চেয়ে বেশি উৎসর্গ করেছেন। মায়ের বুক খালি করে তার সন্তানকে ছিনিয়ে নিলে যদি আপনি ব্যথিত হন তাহলে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতকে ছিনিয়ে নিলে কেন ব্যথা জাগবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না, যে পর্যন্ত আমি তার কাছে তার জান-মাল পিতা-মাতা ও সন্তানাদির চেয়েও প্রিয় না হব।"

এই গ্রামে প্রথম যারা দাওয়াত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েন মাওলানা আনীসুর রহমান সাহেব তাদের অন্যতম। এবারের সফরে তিনি কিছু সাথী নিয়ে একটি গাড়িতে আর আমরাও কিছু আহবাবকে নিয়ে আরেকটি গাড়িতে আল্লাহর নামে সফর শুরু করি। ৫/১১/১৬ ঈ. সকাল ৬.০০ প্রথমে কাকরাইল মসজিদে গেলাম, সেখান থেকে শহীদুল ইসলাম ভাইকে নিয়ে বার ঘন্টার রাস্তা পার হয়ে রাত ৭.০০ কুড়িগ্রাম পৌঁছলাম। সফরসঙ্গী ৬ জন। খাবারের পর চিটপাইকেরছড়া গ্রামের একটি মাদরাসায় গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে এলাকার খোঁজ-খবর পাওয়া গেল।

'প্রেস ভেটেরিয়ান চার্চ অব বাংলাদেশ' নামে একটি এনজিও ২০০০ সালে এখানে কাজ শুরু করে। এর প্রধান বেচাং ওয়ার্ড আইউব। বাড়ি চট্টগ্রাম। সেও একজন ঈমান বিক্রেতা, এখন সওদাগর। গাজিপুর জেলার মিকি পাড়ায় এর প্রধান কার্যালয়। জামালপুরের মাদারগঞ্জ, বরিশালের গলাচিপা, ময়মনসিংহের গরিপুরসহ নেত্রকোণা, কুষ্টিয়া ও মানিকগঞ্জে এর কার্যক্রম বিস্তৃত।

এরা এদের কার্যক্রমকে তিনটি শিরোনামের অধীনে পরিচালিত করে : ১. শিক্ষা-প্রোগ্রাম ২. কৃষি প্রোগ্রাম ৩. ধর্মীয় প্রোগ্রাম। এরা এই গ্রামে ২০০৪ ঈ. সালে স্কুল প্রতিষ্ঠা করে সরকারী নিবন্ধের আওতায় নিয়ে আসে। ২০০৬ ঈ. এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলে ক্লাস শুরু হয়। এই

সালেই গীর্জা প্রতিষ্ঠা করে। গীর্জার উপরে লেখা আছে ‘অসহায় ছিন্নমূলদের সেবায় নিয়োজিত’। গীর্জায় লেখা এই বাক্যটি তাদের সেবার লক্ষ্য উদ্দেশ্য পরিষ্কার বর্ণনা করছে। সেবার শিরোনামে ধর্মান্তরিতকরণই যে এদের প্রধান কাজ এতে লুকোছাপা কিছু নেই।

আজাদ ফকীর নামে এক লোক এদেরকে এই গ্রামে নিয়ে আসে। তার জমিতেই খ্রিস্টানরা স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করে। জহুরুল নামে এক লোক এখানে এই গীর্জার রক্ষণাবেক্ষণ করত। ১৯৯২ সালে সে এদের দলভুক্ত হয়। মহান আল্লাহর শোকর, তিনি এই আজাদ ও জহুরুলকে হেদায়েত দিয়েছেন। শত বারের উপর গাশত করার পর গত কয়েক মাস আগে দুজনই ইসলাম কবুল করেন।

ধর্মান্তরিতের তুফানসম ফিতনা দেখে আমরা অনেক সময় হাল ছেড়ে মূসা আলাইহিস সালামের কওমের মত বলি, আমাদের কিছু করার দরকার নেই। আল্লাহর দ্বীন আল্লাহই রক্ষা করবেন-

اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَٰهُنَا قَاعِدُونَ .

‘তুমি আর তোমার রব গিয়ে যুদ্ধ কর আমরা এখানে বসে থাকব।’

মনে রাখতে হবে এই একটি চিন্তাই এ উম্মতের ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

২০১৪ সালে মাওলানা আনীসুর রহমান সাহেব তার অতি সাধারণ এক ছাত্র মাওলানা শামীমকে সাল লাগানোর পর এখানে দাওয়াতের এই কাজে পাঠিয়ে দেন। আমি নিজেও কয়েকজনকে প্রস্তুত করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। শামীমের ইলম, বয়ান, উপস্থাপনা কোনটাই উল্লেখ করার মত ছিল না। তার চেয়ে অনেক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র আমাদের আশেপাশে ঘুরছে কিন্তু যে কাজ আল্লাহ পাক শামীমকে দিয়ে করিয়েছেন তা দায়ীদের জন্য স্মরণীয় পাথেয় হতে পারে। খুব সংক্ষেপে বিষয়টি তুলে ধরছি :

১. ইরতেদাদের ফেৎনা এখানে এক ভয়াবহ তুফানের রূপ ধারণ করেছিল। আলহামদু লিল্লাহ, আল্লাহ তাআলা সে তুফান থামিয়ে এখন ঈমানী সুবাতাস প্রবাহিত করেছেন। ফলে এ পর্যন্ত ৪২ জন খ্রিস্টান ইসলাম কবুল করেছে। পরিচয় গোপন রাখা কিছু পথহারা মুসাফির এখনও ঘরে ফিরতে পারেনি। আল্লাহ তাআলা ৪২ জন ঘরের ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

২. দাওয়াতের মেহনতকে ঘরে ঘরে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে এক বিশাল সফলতা আল্লাহ তাআলা দান করেছেন। যার প্রমাণ হল ৫/১১-এর মাহফিলে প্রায় ১০ হাজার পুরুষ ও ১২ হাজার (আনুমানিক) মহিলা শরীক হয়। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কে কে সময় লাগিয়েছেন? সবাই হাত উঠাল। স্টেজে বসা উপজেলা চেয়ারম্যান জনাব নূরুন্নবী সাহেবও তিন দিন লাগিয়েছেন। দুই বছরে মাওলানা শামীম ৫৭ জনকে চিল্লায় বের করেছে। যার কারণে এখন মসজিদভর্তি মুসল্লী ও মজলিসভর্তি দ্বীনদার শ্রেণি। আর মাদরাসাভর্তি তালিবুল ইল্ম, যা না দেখলে বিশ্বাস করা কঠিন।

৩. শিক্ষা কার্যক্রম হচ্ছে যে কোনো আদর্শের অন্যতম মূল বাহন। এজন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোনো এলাকার লোক ইসলাম গ্রহণ করলে সেখানে মুয়াল্লিম পাঠিয়ে দিতেন। সেই ধারাবাহিকতায় আমাদের মাশায়েখ মক্তবের উপর খুব জোর দিতেন। সে চিন্তা করেই চিটপাইকেরছড়া গ্রামে দুই বছর আগে একটি মাদরাসা কায়েম করা হয়েছে। যেখানে ২৫০ শিশু পড়াশুনা করে। এদের মধ্যে ১০৪ জন এলিজাবেথ মেমোরিয়াল স্কুলের ছাত্র এবং ঈমান ছিনতাইয়ের ফাঁদের শিকার মুসলমানদের সন্তান। ৬/১১/১৬ ঈ. রবিবার সকালে আমরা শিশুদের নিয়ে বসলাম। দ্বীন শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে শিশু উপযোগী কিছু আলোচনা হল। তারপর দুআ হল। মুসলমানকে গীর্জায় নিয়ে প্রার্থনা করানোর কথা শুনে হৃদয়ে যে রক্তক্ষরণ হচ্ছিল সেই রক্তই যেন তপ্ত অশ্রু হয়ে প্রবাহিত হল।

মাদরাসার জন্য একজন নতুন চিল্লার সাথী প্রায় এক বিঘা জমি দান করেছেন। ৭.৭ ফুট গর্ত ছিল। ২১৬০০০ টাকার মাটি সেখানে ফেলা হয়েছে এবং টিন দিয়ে চারটি ঘর তৈরি করা হয়েছে। ঐ ঘরগুলোতেই ২৫০ শিশুর শিক্ষা কার্যক্রম চলছে। রবিবার সকালে আমাদের আরও তিনটি মজলিস হয়েছে। একটি সফরের সাথীদের নিয়ে। যে মজলিসের উদ্দেশ্য ছিল, তারা যে মুসলমানদের খ্রিস্টান বানিয়ে ফেলেছে- এ বিষয়ে আমাদের করণীয় কী। দ্বিতীয় মজলিস এলাকার গণ্যমান্য লোকদের নিয়ে। সেখানে মূলকথা ছিল, আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করলে আল্লাহ তাআলা তাকে কীভাবে পুরস্কৃত করেন। তৃতীয় মজলিস ছিল শিক্ষকদের সাথে। সেখানে মূলকথা ছিল, একটি পণ্য ফ্যাক্টরী থেকে যে রূপ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হয় সেই রূপের আর পরিবর্তন হয় না। মাদরাসা হচ্ছে ঈমানদার তৈরির ফ্যাক্টরী, এখান থেকে একজন ছাত্র যে গুণ ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে বের হবে, শেষ দিন পর্যন্ত ইনশাআল্লাহ সে অবস্থায়ই থাকবে। তারপর আমরা কুড়িগ্রাম তাবলীগী মার্কাযে এসে সকালের নাস্তা সারলাম। এরপর ঢাকায় রওনা করে রাত ১১. ৩০ মি: বাসায় পৌঁছলাম।

কুড়িগ্রামে রাস্তার পাশে অসংখ্য মসজিদ চোখে পড়ে, যা আরবদেশের বিভিন্ন সংস্থা তৈরি করেছে। কিন্তু মসজিদ পাকা করার সাথে সাথে মুসল্লি পাকা করার মেহনত না থাকায় মসজিদগুলোতে প্রাণের স্পন্দন নেই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগে মসজিদ কাঁচা ছিল মুসল্লি পাকা ছিল, আমাদের মসজিদ পাকা কিন্তু আমরা মুসল্লিরা কাঁচা।

রাতে যখন আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাচ্ছিলাম তখন দেখেছি মাদরাসা ও মাহফিল নিয়ে ধারণাতীত উৎসাহ-উদ্দীপনা। আর পুরা রাস্তায় জনস্রোত। মাহফিলের শামিয়ানা পরিণত হয়েছিল সকল স্রোতের মোহনায়।

প্রিয় পাঠক! একজন মা যদি প্রসব বেদনা সহ্য করার জন্য প্রস্তুত না হন তাহলে একটি শিশুর জন্মও হয় না, কারো মুখে হাসিও ফোটে না। এখানেও একজন দায়ীকে 'প্রসববেদনা' সহ্য করতে হয়েছে, যার ফল সবার মুখের হাসি। ১৩/৪/২০১৪ সালে এই গ্রামে এসে তাকে যাযাবরের মত ১৩টি মাস কাটাতে হয়েছে রাতে চোখের পানি দিয়ে বুক ভাসিয়েছেন আর দিনে আক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। এইভাবে ১৩ মাস মেহনতের পর মাদরাসার জায়গার ব্যবস্থা হয়।

এই গ্রামের পাশেই রুপকুমার নদী। খ্রিস্টানরা কাউকে খ্রিস্টান বানাতে চাইলে এই নদীতে তাকে গোসল করাত। এই গোসলের মাধ্যমে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করত। এই কাজকে তারা ব্যাপটিজ বলে। আরবীতে- استصباغ বলে। একজনকে এনে গোসল দেয়াতে পারলে ১০০০০ হাজার টাকা দেয়া হত। এটা তাদের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসা মুসলমানদের বক্তব্য।

উপায়-উপকরণ ছাড়া কেবল আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মুহাব্বত আর এখলাসের মধ্যে আল্লাহ যে কত শক্তি রেখেছেন- চিটপাইকেরছড়া গ্রামটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গত নভেম্বর মাসের শুরুতে এনজিওপ্রধান কুড়িগ্রাম জেলার ডাকবাংলোতে গিয়েছেন, গিয়ে যখন শুনলেন তার পাতা জালে আর মাছ ধরা পড়ছে না তখন চরম হতাশা প্রকাশ করেন। আর কোটি কোটি টাকার লস প্রজেক্ট দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কুড়িগ্রাম থেকে বিদায় নেন।

আসলে এই উম্মতের বড় প্রয়োজন কিছু উৎসর্গিতপ্রাণ মুসলিম দায়ীর, যাদের সবকিছু হবে আল্লাহর জন্য। ঈমান হবে হিমালয়ের মত। যাদের পরিচয় হবে 'রুহবান ফিল লাইল্, ফুরসান ফিন নাহার'। যদি সত্যিই তাদের পাওয়া যায় তাহলে ইসলাম সোনালী প্রভাতের রক্তিম সূর্য হয়ে আবার উদিত হবে। কবি ফররুখের ভাষায়-

আবার বিলাল হাঁকিবে আযান মক্কার ঐ মিনার চূড়ে/হায়দারি হাঁক হাঁকবোরে ফের উঠব আবার বিশ্ব ফুঁড়ে।

পরিশেষে আল্লাহর দরবারে তাঁর সুন্দর-সুন্দর নাম ও উচ্চ গুণাবলীর উসীলায় প্রার্থনা করি, তিনি যেন মুসলিমদের বিক্ষিপ্ততাকে একত্রিত করে দেন, তাদের পরস্পরের আন্তরিকতাকে সুদৃঢ় করেন, তাদেরকে সংশোধন করেন এবং প্রশান্তির পথে তাদেরকে পরিচালিত করেন, পক্ষান্তরে শত্রুদের ষড়যন্ত্র থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন, তাদের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রদান করেন, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য যাবতীয় অশ্লীলতা ও ফিতনা থেকে তাদেরকে রক্ষা করেন। নিশ্চয় তিনি অতিশয় দয়াবান।

হে আল্লাহ! যে কেউ ইসলাম ও মুসলিমদের অনিষ্ট সাধনের ইচ্ছা পোষণ করে তাকে তার নিজের ব্যাপারে ব্যস্ত রাখো, তার ষড়যন্ত্র তার ঘাড়ে ফিরিয়ে দাও এবং তার সকল অনিষ্ট পোষণের গন্ডি তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখ, নিশ্চয় তুমি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।

سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين

রেফারেন্সসমূহঃ

[১] আফরোযা খাতুন, কোরপাই, বুড়িচং, কুমিল্লা, 'দাওয়াতের গুরুত্ব ও দাঈর গুণাবলী', মূলপাতা > নভেম্বর ২০১৬ > মহিলাদের পাতা। https://at-tahreek.com/article_details/713

[২] মুফতী আবদুল্লাহ নাজীব, 'মিশনারী আক্রান্ত বাংলাদেশ: প্রয়োজন ঈমান প্রদীপ্ত দাঈর'June 22, 2021।

https://suffanews.com/ মিশনারী-আক্রান্ত-বাংলাদে/

[০৩] Ershad Ahmed, Dhaka, Bangladesh, 'Churches of Dhaka', MONDAY, NOVEMBER 06, 2006। http://dhakadailyphoto.blogspot.com/2006/11/churches-of-dhaka.html

[৪] মাওলানা মুফতী যুবায়ের আহমেদ, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক ও দাঈ, ইসলামিক দাওয়া ইন্সটিটিউট, ‘বাংলাদেশে খৃষ্টান মিশনারির অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়’, সূত্রঃ পয়গামে সুন্নত ১৪৩১-৩২ হিজরি, (মুসলিম বিশ্বে ইহুদী খৃষ্টানদের মরণ ছোবল) ।
https://thegreatestnation.wordpress.com/2018/11/21/বাংলাদেশে-খৃষ্টান-মিশনার/

[৫] Religion in Bangladesh।

https://en.wikipedia.org/wiki/Religion_in_Bangladesh

[৬] ‘খ্রিষ্টান মিশনারী : হুমকির মুখে ইসলাম ও বাংলাদেশ’, মূলপাতা ফেব্রুয়ারী ২০২১ সম্পাদকীয়।

https://ikhlasbd.com/article_details/7644

[৭] ‘খ্রিস্টান মিশনারী তৎপরতা প্রতিরোধের উপায়সমূহ’।

https://www.hadithbd.com/books/detail/?book=85&section=1160

[৮] মাওলানা আব্দুল মাজীদ, ‘খ্রিস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে একজন দায়ীর সফলতা ও কিছু প্রস্তাব’, বর্ষ: ১৩, সংখ্যা: ০১। https://www.alkawsar.com/bn/article/1930/